GEO- SPACE

কালিনগর মহাবিদ্যালয়
ভূগোল বিভাগের নিজস্ব পত্রিকা

GEO- SPACE

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংস্করণ

সম্পাদক ঃ কঙ্কন রায়

সহ সম্পাদক ঃ ডঃ কল্যাণ কুমার মন্ডল

কার্যনির্বাহী কমিটি ঃ অমিতাভ দাস, অমিয় বিকাশ গিরি, আনোয়ার হোসেন গাজী, রিন্টি দাস, আকাশ রাউত, চঞ্চল আদক, রাখি দাস

প্রকাশক ঃ ডঃ ঈশানী ঘোষ, ভারপ্রাপ্ত অধ্য(া, কালিনগর মহাবিদ্যালয়

কপিরাইট ঃ @ কালিনগর মহাবিদ্যালয়

প্রচ্ছদ ঃ প্রিন্ট দ্যুতি

বর্ণস্থাপন ও মুদ্রণ ঃ প্রিন্ট-অল, বসিরহাট

তারিখ ঃ ১০ ই জুন, ২০২৩

শুভেচ্ছাবার্তা

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের কলেজের ভূগোল বিভাগ প্রথমবার ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা নিয়ে একটি বিভাগীয় পত্রিকা প্রকাশ করতে চলেছে। আমি এই উদ্যোগের জন্য ভূগোল বিভাগের সকল অধ্যাপক ও যারা লিখেছো সেই সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দন জানাই। আশাকরি এই পত্রিকা কলেজের অন্যান্য বিভাগের কাছে একটি অনুকরনীয় উদ্যোগ হিসেবে গৃহীত হবে, তারাও এই ধরনের উদ্যোগ পূরণে এগিয়ে আসবে। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মেলবন্ধনে এই পত্রিকার আগামীদিনে আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, এই কামনা করি।

সকলে ভালো থেকো

Ishani Ghosh

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

কালিনগর মহাবিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

শুধু ভূগোল বিভাগের একটি সতন্ত্র পত্রিকা প্রকাশের প্রথম প্রয়াস হিসাবে 'জিও স্পেস' প্রকাশিত হল। বিভিন্ন ভৌগোলিক বিষয় যেমন পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, তার জীবনধারন প্রনালী, জীববৈচিত্র ইত্যাদি যেমন বিভিন্ন লেখাতে স্থান পেয়েছে, তেমনই আবার স্থান করে নিয়েছে সমাজের বিভিন্ন সমসাময়িক জলন্ত সমস্যাগুলি, যা বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার দাবী রাখে। প্রথম প্রয়াস হিসাবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের লেখার উদ্যম প্রশংসনীয়। তাছাড়া, তথ্যের প্রয়োজনে বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র পত্রিকা ও আর্ন্তহাল অনুসন্ধান ইত্যাদি ছাত্রছাত্রীদের আরো বেশি অনুসন্ধিৎসু করে তোলে যা তাদের উচ্চতর শি(া ((ত্রে সম্পদ হিসাবে গণ্য হতে পারে।

ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের আরো ভাল, আরো সুন্দর লেখার আশায় রইলাম। এই পত্রিকা হয়ে উঠুক গবেষণা ধর্মী প্রবন্ধ লেখার আঁতুড় ঘর।

কঙ্কন রায়

সূচীপত্র

* **পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় বিশ্বজনীন উদ্যোগ** — হিরণময় বাছাড়, 4th Sem. Geo (H)
* **সুন্দরবনের মানুষ বন্যপ্রাণী সংঘাত** — নীলাঞ্জনা মাহাতো, 4th Sem. Geo (H)
* **জীববৈচিত্র্য** — চঞ্চল আদক, 4th Sem. Geo (H)
* **ভারতে আঞ্চলিক অসমতা** — ধ্রুবজ্যোতি সরদার, 4th Sem. Geo (H)
* **পরিবেশ দূষন ও বিশ্বউষ্ণায়ন** — (পাল গায়েন, 6th Sem. Geo (H)
* **ভারতে নারী শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান** — কথা বর, 6th Sem. Geo (H)
* **শিলং ঃ একটি ভ্রমণ অভিজ্ঞতা** — রচনা বর, 6th Sem. Geo (H)
* **সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য** — (মানা পারভীন, 6th Sem. Geo (H)
* **আধুনিক ভারতে ভূগোলের জনক হিসাবে শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অবদান** — অভিজিত দাস, 6th Sem. Geo (H)
* **জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০২০** — ডঃ কল্যাণ কুমার মণ্ডল
* **উত্তর সেন্টিনেলী জনগোষ্ঠী** — সুমন কর্মকার, 6th Sem. Geo (H)
* **মাসাই** — রিয়া মন্ডল, 2nd Sem. Geo (H)

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় বিশ্বজনীন উদ্যোগ

— হিরণময় বাছাড়, 4th Sem. Geo (H)

ভূমিকা ঃ- পরিবেশ হল এমন একটি গতিশীল ব্যবস্থা যা জীবন এবং প্রকৃতির অস্তিত্ব ধারণ এবং উন্নয়ণকে প্রভাবিত করে। মানুষের জীবন যাত্রা কতটুকু স্থায়ী তা নির্ভর করে মানুষের সাথে পরিবেশের কী ধরণের সম্পর্ক তার উপর। এই সম্পর্কে অতিমাত্রায় ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি পরিবেশকে মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী তা করে তোলে এবং পরিবেশের গুণাবলিকে ক্রমশ নষ্ট করে। এই অবস্থায় পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যতকে নিরাপদ করার জন্য পরিবেশের সুষ্ঠু পরিচালনা অপরিহার্য। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মূল কথা হল সম্পদের সুষ্ঠু ও নূন্যতম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশের ওপর মানুষের ক্ষতিকর প্রভাব যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা এবং পরিবেশ উন্নয়ণের মাধ্যমে পরিবেশের গুণগতমান বজায় রাখা।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা ঃ- যে পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলির সুপরিকল্পিত ব্যবহার ও যথাযথ সংরক্ষণের দ্বারা পরিবেশের গুণগত মান বজায় রাখা হয়, যাতে পরিবেশের কার্যপ্রণালী অক্ষুন্ন থাকে তাকে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বলে।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বজনীন উদ্যোগের কারণ ঃ- পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি ব্যাপ্তি পাওয়ার পর সেই সমস্যা সমাধানে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ চিন্তাভাবনা শুরু করে। কারণ পরিবেশের সমস্যার সুস্থ সমাধান কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন দেশে সরকারি বেসরকারি সংস্থা নীচু স্তরে এই ভাবনা চিন্তা শুরু করে এবং বিভিন্ন দেশগুলি আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির সহযোগিতায় পরিবেশ সম্মেলনের আহ্বান করে। পরিবেশ সংক্রান্ত প্রথম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিওতে।

উদ্দেশ্য ঃ- বিশ্বে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল —

১) প্রাকৃতিক সম্পদের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়া।

২) পরিবেশ দূষণের উৎস নিয়ন্ত্রণ।

৩) পুনর্ভব সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং অপুনর্ভব সম্পদের ব্যবহার হ্রাস করা।

৪) সম্পদের জীব অবিশ্লেষ্য পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা এবং এই জাতীয় পদার্থ সমূহের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো।

৫) কোনো উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহন করার পূর্বে পরিবেশগত পরিকল্পনা এবং আয়-ব্যয় পর্যালোচনা করা বাধ্যতামূলক করা।

৬) পরিবেশকে প্রভাবিত করে এমন কোনো প্রকল্প গ্রহন করার পূর্বে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সেই কারণে পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা।

৭) পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও রূপায়ন।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বজনীন উদ্যোগ সমূহ ঃ- সংরক্ষণ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে যেসব আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় সেগুলি নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল —

বসুন্ধরা সম্মেলন ঃ- জাতিসংঘের উদ্যোগে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিও তে ১৯৯২ সালের ৩ রা জুন থেকে ১৪ ই জুন পর্যন্ত পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেটি বসুন্ধরা সম্মেলন বা

Earth Summit নামে পরিচিত। প্রতি বছর ২২ শে এপ্রিল বসুন্ধরা দিবস পালিত হয়।

বসুন্ধরা সম্মেলনে গৃহীত পদ(প ঃ- ১৯৯২ সালের বসুন্ধরা সম্মেলনে গৃহীত পদ(প নিম্নে আলোচনা করা হল —

১) দূষণকারী রাষ্ট্রকেই নীতিগত ভাবে দূষণের সমস্ত ভার বহন করতে হবে। প্রতিটি রাষ্ট্রকেই তার সামর্থ অনুসারে পরিবেশ র(ার উপযুক্ত(ব্যবস্থা নিতে হবে।

২) কোনো প্রাকৃতিক রাজনৈতিক ত্রি(য়াকলাপের দ্বারা কোনো রাষ্ট্রের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি যদি (তিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে তাহলে রাষ্ট্রকে আগে থেকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩) রাষ্ট্রকে কোনো প্রাকৃতিক দূষণের আভাস পাওয়া মাত্রই আশেপাশের রাষ্ট্রগুলিতে এ বিষয়ে সতর্ক করতে হবে যাতে তারা ওই দূষণের বি(দ্ধে উপযুক্ত(ব্যবস্থাগ্রহণ করতে পারে। যে কোনো পরিস্থিতিতে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক র(া আবশ্যক।

৪) মহিলা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ণে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করে। তাই সুস্থায়ী উন্নয়ণের জন্য মহিলাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

৫) রাষ্ট্রকে পরিবেশ সংত্র(ান্ত সমস্যাগুলি শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাধান করতে হবে।

৬) বি(্বের ত(ন নাগরিকদের সুস্থায়ী উন্নয়ণের বিষয়ে উৎসাহি করতে হবে যাতে তারা তাদের সৃষ্টিশীলতা আদর্শ ও সাহস দিয়ে আরও সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারে।

৭) যুদ্ধের মনোভাব সুস্থায়ী উন্নয়ণের পরিপন্থী। যুদ্ধ অপরিহার্য হলে যুদ্ধকালীন অবস্থায় পরিবেশ সুর(া সংত্র(ান্ত নিয়মকানুন গুলি সমস্ত দেশগুলিকে মেনে চলতে হবে।

মন্ট্রিল চুক্তি(ঃ- মন্ট্রিল চুক্তি(হল পরিবেশ সংত্র(ান্ত ব্যবস্থাপনার সাপে(এক অন্যতম প্রধান বি(্বব্যাপী উদ্যোগ। ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ওজন স্তরের ধ্বংসের কারণ ও সুর(া নিয়ে কানাডার মন্ট্রিল শহরে এক বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সম্পাদিত হওয়া আন্তর্জাতিক চুক্তি(টিই মন্ট্রিল প্রটোকল নামে সুপরিচিত। প্রথম ২৪টি দেশ এই চুক্তি(তে স্বা(র করে। বর্তমানে ওজন চুক্তি(স্বা(র করা মোট দেশের সংখ্যা ১৯৭। ১৯৯১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ভারত মন্ট্রিল চুক্তি(র সদস্য পদ গ্রহন করে।

সংশোধন ঃ- ১৯৮৭ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালে লন্ডনে, ১৯৯১ সালে নাইবেরিতে, ১৯৯২ সালে কোপেনহেগেন, ১৯৯৩ সালে ব্যাঙ্ককে, ১৯৯৫ সালে ভিয়েতনামে, ১৯৯৭ সালে মন্ট্রিলে এবং ১৯৯৯ সালে বেজিং এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বারবার মন্ট্রিল চুক্তি(সংশোধিত হয়েছিল।

চিহ্নি(ত দূষক পদার্থ ঃ- মন্ট্রিল চুক্তি(তে মোট ৫টি অতিগু(ত্বপূর্ণ ওজন স্তর বিনাশকারী দূষককে চিহ্নি(ত করা হয়। এই দূষকগুলি হল - ট্রাইক্লোরোফ্লুরো মিথেন (CFC-111), ডাই ক্লোরোফ্লুরো মিথেন (CFC-112) ট্রাই ক্লোরোফ্লুরো ইথেন (CFC-113), ডাই ক্লোরোফ্লুরো ইথেন (CFC-114), ক্লোরোপেন্টাফ্লুরো ইথেন (CFC-115)।

মন্ট্রিল চুক্তি(তে গৃহীত নীতি ঃ- মন্ট্রিল চুক্তি(র গৃহীত নীতিগুলি হল —

১) ১৯৯৫ সালের মধ্যে সব উন্নত দেশগুলিকে CFC এবং হ্যালোন উৎপাদন বন্ধ করতে হবে।

২) কার্বন টেট্রাক্লোরোইড এবং ট্রাইক্লোরাইড ইথেন এর উৎপাদন ধীরে ধীরে বন্ধ করতে হবে।

৩) ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের পরিবর্ত দ্রব্য হিসাবে হাইড্রো ক্লোরোফ্লুরো কার্বন এবং হাইড্রোফ্লুরো কার্বন যৌগের ব্যবহার ২০৪০ সালের মধ্যে বন্ধ করতে হবে।

৪) উন্নত দেশগুলি CFC এর ব্যবহার মাথাপিছু 1.2 Kg. থেকে কমিয়ে 0.3 Kg. করবে।

মন্ট্রিল চুক্তি(র প্রভাব ঃ- মন্ট্রিল প্রোটোকল ওজন স্তরের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ২০২০ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখাগেছে, ওজন (য়কারী পদার্থ থেকে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে প্রবেশ করা মোট ক্লোরিনের পরিমাণ ১৯৯৩ সালে তার সর্বোচ্চ থেকে 11.5% হ্রাস পেয়েছে। স্ট্রাটোস্ফিয়ারে প্রবেশকারি মোট ব্রোমিনের পরিমাণ ১৯৯৯ সালে সর্বোচ্চ থেকে 14.5% হ্রাস পেয়েছে।

কিয়াটো প্রটোকল ঃ- কিয়াটো প্রটোকল হল একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি(যার ল(্য গ্রিন হাউস গ্যাস নিগর্মন কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বি(দ্ধে লড়াই করা। UNO এর UNFCC এর অধিনে ১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর জাপানের কিয়াটো শহরে এটি গৃহিত হয়েছিল এবং ২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি এটি কার্যকর হয়।

চিহ্নি(ত দূষক গ্যাস ঃ- কিয়াটো প্রটোকল চুক্তি(তে বি(্বে উষ(ায়নের প্রধান আসামী হিসাব ৬টি গ্যাসকে চিহ্নি(ত করেছে। এগুলি হল - ১) কার্বন-ডাই অক্সাইড (CO_2), ২) মিথেন (CH_4), ৩) নাইট্রাস অক্সাইড (NO) ৪) হাইড্রোফ্লুরো কার্বন (HFC) ৫) পারফ্লুরো কার্বন (PFC) এবং সালফার হেক্সাক্লোরাইড (SF_6)।

কিয়াটো প্রটোকলের নীতি ঃ- কিয়াটো প্রটোকল সাধারণ কিন্তু ভিন্ন দায়িত্ব নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি উন্নত দেশগুলির উপর বর্তমান নির্গমন হ্রাস করার বাধ্যবাধকতা রাখে। কারণ তারা ঐতিহাসিক ভাবে বায়ুমন্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের বর্তমান স্তরের জন্য দায়ী।

CBDR (Common But Differentiated Responsiblities অনুসারে কিয়াটো প্রটোকল বিভিন্ন দেশের দায়িত্বকে দুটি ভাগে ভাগ করে - ১) অ্যানেক্স ২) নন-অ্যানেক্স।

১) অ্যানেক্স (ঐতিহাসিক দূষণকারী দেশ) ঃ- ঐতিহাসিক ভাবে শিল্প বিপ্-বের পর থেকে সবচেয়ে বড় দূষণকারী উন্নত দেশগুলি পৃথিবীকে দূষিত করেছে। এই দেশগুলির মধ্যে রয়েছে। মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান, রাশিয়া ইত্যাদির মতো উন্নত দেশগুলিকে GHG (Green House Gas) হ্রাস করার উপায়গুলি বাস্তবায়নে আরও অবদান রাখতে হবে। তাদের এটি নিম্নরূপ উপায়ে করতে হবে।

* GHG নির্গমনের নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক সীমা গ্রহণ করা।
* উন্নয়নশীল এবং শিল্পন্নত দেশগুলিতে GHG নির্গমনে হ্রাস করার জন্য তহবিল প্রদান।

২) নন-অ্যানেক্স (সাম্প্রতিক দূষণকারী দেশ) ঃ- সাম্প্রতিক দূষিত উন্নয়নশীল দেশগুলি হল সেই দেশগুলি সেগুলি ১৯৫০ সাল থেকে দূষণ করে চলেছে। এর মধ্যে রয়েছে চীন, ভারত, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশ। এই ধরণের দেশগুলোর GHG নির্গম কমাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। তবে এই দেশগুলি বাধ্য নয় এবং দেশগুলি দ্বারা নেওয়া প্রতিটি উদ্যোগ স্বেচ্ছাধীন।

*** কিয়োটো প্রটোকলের সাফল্য ও ব্যর্থতা ঃ-** এখনো পর্যন্ত (ডিসেম্বর ২০০৮) বি(্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল সব মিলিয়ে ১৭৪টি দেশ এই চুক্তি(তে সা(র করেছে। কিন্তু GHG বৃদ্ধির দুই প্রধান আসামী মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া নিজেদের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার অজুহাতে চুক্তি(স্বা(র করেনি। ফলে স্বাভাবিক ভাবে বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাসের স্তর কমার পরিবর্তে বাড়ছে। ২০০৬ সালে ১৩ নভেম্বরে প্রকাশিত নেদারল্যাণ্ড এবং EU এর মিলিত গবেষণার রিপোর্টে দেখাগেছে — সারা বি(্বে ১৯৭৫ থেকে ২০০৪ এর মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস বেড়েছে ৭৫ শতাংশ। এই সময় বায়ুতে অতিরিক্ত(যোগ হয়েছে ৪৫০০০ মেগাটন CO_2। সুতরাং কিয়াটো চুক্তি(সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থতায় পর্যবশিত।

প্যারিস চুক্তি((Paris Agreement) **ঃ-** ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে কার্যকর হয় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক

জাতিসংঘ কনভেনশন UNFCC। কার্যকর হওয়ার পর থেকে UNFCC প্রতিবছর Conference of the parties বা সংে পে COP নামে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনের আয়োজন করে আসছে। যার ধারাবাহিকতায় ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে জলবায়ু সম্মেলনে (COP-21) বৈশ্বিক উষ(তা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্বন নির্গমন কমানো ও পরিবেশ র(ার বিষয়ে চুক্তি(র খসড়া চূড়ান্ত হয়। ১৯৫ টি দেশ ১৩ দিন ধরে আলোচনা করে এই খসড়া তৈরি করে। এর কিছু দিন পর ২০১৬ সালের এপ্রিলে জাতিসংঘের সদর দফতর অর্থাৎ নিউইয়র্কে এই খসড়া চুক্তি(রূপে স্বা(রিত হয়। এটি প্যারিস এগ্রিমেন্ট বা প্যারিস চুক্তি(নামে পরিচিত।

চুক্তি(র গু(ত্বপূর্ণ ঘোষণা ঃ- বিশ্ব উষ(য়ণের ফলে দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা। যার প্রভাবে আঞ্চলিক জলবায়ু পরিবর্তন ঘটে চলেছে। বিশ্ব উষ(ায়নের ফলে দ্রুত হারে মে(অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্র তলের উচ্চতা সারা পৃথিবী জুড়ে বেড়েই চলেছে। ফলে (তি হচ্ছে সমুদ্র লাগোয়া দেশ ও শহরগুলি। তাই এই চুক্তি(র মূল ল(্য হল বিশ্বের তাপমাত্রার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ রাখা। সেই উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এগুলি হল —

১) সদস্য দেশগুলিকে একবিংশ শতাব্দীর শেষের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা 2^0C এ সীমাবদ্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করতে বাধ্য করা এবং CO_2 নির্গমন 20% হ্রাস করার জন্য ২০৫০ সালের মধ্যে তাপমাত্রা 15^0C এর নীচের রাখার জন্য কিছু অতিরিক্ত(প্রচেষ্টা চালানো, কারণ CO_2 বিশ্ব উষ(ায়নের জন্য দায়ী মূল GHG গ্যাস।

২) প্যারিস চুক্তি(তে পরিষ্কার, দূষণমুক্ত(এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি(উৎপাদন 20% বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

৩) প্রথাগত শক্তি(উৎপাদন পদ্ধতির উপর নির্ভরতা হ্রাস করার জন্য। শক্তি(দ(তা 20% বৃদ্ধির ল(্য রাখতে বলা হয়েছে।

৪) উন্নয়ণশীল দেশগুলোকে আর্থিক ও প্রযুক্তি(গত সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নত দেশগুলোর প্রতি দায়বদধতা অর্পন।

৫) প্যারিস চুক্তি(র আওতায় পরিবেশগত কর্মসূচীতে সহায়তা করার জন্য ধনী ও উন্নত দেশগুলোকে ২০২০ সালের পর থেকে কমপ(১০০ বিলিয়ন ডলারের বার্ষিক তহবিল বজায় রাখতে হয়েছে।

মতামত ঃ- ত্র(মবর্ধমান বিশ্ব উষ(ায়ন থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে প্যারিস চুক্তি(প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক খসড়া যাতে সহমত হয়েছে বিশ্বের প্রায় ২০০ টি দেশ। ভারত, চিন সমেত জি-৭৭ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত(সমস্ত দেশ এতে স্বা(র করেছে। কিয়াটো প্রটোকলের ব্যর্থতা থেকে শি(া নিয়ে এর খসড়া তৈরি হয়েছে। ইতিহাসে এই প্রথমবার জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সব বিতর্ককে সরিয়ে রেখে একযোগে জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবিকলা করতে ধনী দরিদ্র বিশ্বের সব দেশ এক ছাতার তলায় এসেছে এবং ঐক্যমত্য হয়েছে। সেই অর্থে এটি ঐতিহাসিক।

সুন্দরবনের মানুষ বন্যপ্রাণী সংঘাত

— নীলাঞ্জনা মাহাতো, 4th Sem. Geo (H)

সুন্দরবনের অবস্থান ঃ- প্রাচীন সমতটের দ(িণ অংশে ভৌগলিক কারণে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ যা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ যা Gangetic Delta নমে বি(্বে পরিচিত। এই ব-দ্বীপ উত্তর-দ(িণে ৪০০ কিলোমিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ দ(িণ অংশ ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র, বর্তমান মায়ানমার দেশের অধুনালুপ্ত কয়েকটি নদী ও ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে নেমে আসা আরও কয়েকটি নদী বিশাল ভূ-ভাগের মধ্য দিয়ে এঁকেবেকে অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত(হয়ে বঙ্গোপসাগরে অবগাহন করে মহামিলনের আস্বাদ গ্রহন করেছে। নদী তীরবর্তী অংশ অরণ্যময়, শ্বাপদমুল ভয়াল অথচ প্রাণময়-সুন্দরবন নামে বি(্বেবন্দিত। এই নামটির আকর্ষন এমনই যে এই নিবিড় অরণ্যে অন্তস্তলে কেবল একটিবার প্রবেশ করে বি(্বেরহস্যের আস্বাদন গ্রহন করার জন্য নবীন ও প্রবীণ প্রাণের আকুতি আজও প্রবহমান।

সুন্দরবন অরণ্যের বিশালতা ও গভীরতা অনন্য। ১৮৮৫ সালের একটি হিসেবে এই অরণ্যের আয়তন ছিল ১৪,০০৪.৩৯ বর্গ কিমি। অবিভক্ত(বাংলায় সুন্দবনের আয়তন ছিল প্রায় দশ হাজার বর্গকিলোমিটার। বর্তমানে বিভক্ত(পশ্চিমবাংলার ভাগে পড়েছে তার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ৪,২৬৮ বর্গকিলোমিটার।

সুন্দরবনের ব্যাপ্তি পশ্চিমে ভাগীরথী নদী বা গঙ্গা নদী থেকে পূর্বে কালিন্দী নদী। কালিন্দী নদী থেকে মেঘন নদীর মোহনা পর্যন্ত (বাংলাদেশ)। কিন্তু মেঘনা- মোহনার পূর্বে অর্থাৎ বাংলাদেশের নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার ও হাতিয়া, সন্দীপ প্রভৃতি দ্বীপের দ(িণ ভাগের অবস্থিত বনাঞ্চলকে অনেকে সুন্দরবনের অন্তর্গত বলে মনে করেন।

ভারতীয় সুন্দরবন কর্কটত্র(ান্তির দ(িণে ২১°৫৩' থেকে ২২°৩' উত্তর অ(াংশে ৮৮°৫১' থেকে ৮৯°৫১' পূর্ব অ(াংশে অবস্থিত। সুন্দরবন ১৪০ কিমি লম্বা পূর্ব-পশ্চিমে এবং দ(িণে বঙ্গোপসাগর থেকে উত্তর দিকে প্রায় ৫০-৭০ কিমি পর্যন্ত সুন্দরবনের আয়তনকে সীমায়িত করেছে ডাম্পিয়ার ও হেজেস বর্ণিত রেখা। ডাম্পিয়ার ও হেজেস ছিলেন বিখ্যাত দুই বিট্রিশ জরিপবিদ। দ(িণ ২৪ পরগণার সাগরদ্বীপ থেকে নিশ্চিন্তপুর, নিমপীঠ, ক্যানিং সীমারেখা বরাবর ভারতীয় সুন্দরবনের পশ্চিমদিকের সীমানা। উত্তরে উত্তর ২৪ পরগণার হাড়োয়া, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, পূর্বে বাংলাদেশ এবং দ(িণদিকে বঙ্গোপসাগর। প্রায় ৩১টি ছোট বড় নদী নিয়ে গঠিত নদীমাতৃক সুন্দরবন। বড় নদীগুলির মধ্যে রায়মঙ্গল, ইছামতী, মাতলা, হেড়োভাঙ্গা, বিদ্যা, গোসাবা, ঠাকুরান, জগদল, সপ্নমুখী, মুড়িগঙ্গা উল্লেখযোগ্য। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রে ব-দ্বীপ সৃষ্টির সাথে সাথে জোয়ারের জল বয়ে আনে পলি সঞ্চয়নের মধ্য দিয়ে আনুমানিক সাত হাজার বছরের ব্যবধানে গড়ে উঠেছে আজকের সুন্দরবনের বাস্তুভূমি।

পলি সমৃদ্ধ সুন্দরবনের ব-দ্বীপ গুচ্ছ দেখতে নীচু চাতাল-এর মতো। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সামান্য উঁচু, কোথাও ৩ মিটার কোথাও বা ৪ মিটার। গঙ্গা ও তার শাখা নদীগুলির থেকে আসা মিষ্টি জলের উৎস ছাড়াও বর্ষার সময় খাঁড়ি নালা হয়ে সুন্দরবনের নদীতে এসে মেশে মিষ্টি জল। আর এই বর্ষার মিষ্টি জল নদীগুলির মোহনায় এসে জলের লবনাক্ত(তা কমিয়ে দেয় বলে ঘন সবুজ ম্যানগ্রোভস এর অস্তিত্ব সুন্দরবনে।

প্রকৃতি ঃ- প্রকৃতি দেবীর নিপুন হাতে সজ্জিত অপূর্ব সুন্দর 'সুন্দরবন' গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ-এর নিম্নাংশে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত ও অসংখ্য নদীবাহিত পলির অব(পনের ফসল। আনুমানিক সাত হাজার বছরের নদীবাহিত পলি সঞ্চিত হয়ে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় সৃষ্ট সুন্দরবনের মোট আয়তন ২৫,৫০০ বর্গ কিমি। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের সুন্দরবনের আয়তন মাত্র ৯,৬৩০ বর্গকিমি। ভারতীয় সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতাভুক্ত(বনাঞ্চল ২,৫৮৫ বর্গ কিমি. বনভূমি ও জলাভূমির সম্মিলিত আয়তন, অর্থাৎ ভারতীয় সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভস অরণ্যের আয়তন ৪,২০০ বর্গ কিমি. ম্যানগ্রোভস বনাঞ্চল হওয়ায় কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ৫,৪৩০ বর্গ কিমি।

সুন্দরবনে মানুষের বাসভূমি ৫৪টি দ্বীপে। ভারতীয় সুন্দরবনে মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২টি। প্রায় ৪২ ল(মানুষের বাসভূমি সুন্দরবনে পঞ্চায়েত সমিতি তথা উন্নয়ন ব্লক সংখ্যা ১৯টি। ভারতীয় সুন্দরবনে বড় ও মাঝারি নদী মিলিয়ে সংখ্যা ৩১টি। এছাড়া অসংখ্য খাঁড়ি, নালা, সুতি খাল বর্তমান। এই ৩১টি নদীর নোনাজলের প-াবন থেকে কৃষিজমি ও ঘরবাড়ি র(া করার জন্য নদীবাঁধ দেওয়া হয়েছে প্রায় ৪,২৫০ কিমি। ভারতীয় সুন্দরবন 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' হিসাবে ঘোষিত হয়েছে ১৯৮৪ সালে। এই সুন্দরবনের মোট আয়তনের মধ্যে ১৯৮৪ সালে ঘোষিত জাতীয় উদ্যানের আয়তন ১,৩১০ বর্গ কিমি। ১৯৮৯ সালে ভারতীয় সুন্দরবনের মোট ৯,৬৩০ বর্গ কিমি আয়তনের প্রায় সবটাই সুন্দরবন জীব পরিমন্ডল হিসাবে ঘোষিত।

জলবায়ু ঃ- আবহাওয়া ও জলবায়ুর বিভিন্ন শর্ত ও নিয়ন্ত্রকগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার। সে কারনে পৃথিবীর প্রত্যেকটি অঞ্চলের জলবায়ুর একটি নিজস্ব রূপ থাকে পৃথিবীর এক অঞ্চলের জলবায়ু অন্য অঞ্চলের জলবায়ুর থেকে আলাদা হয়। সঙ্গত কারণেই সুন্দরবন অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুন্দরবন আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রন করে কয়েকটি প্রাকৃতিক উপাদান। এগুলি হল ১) ত্রান্তীয় পটভূমি, ২) জোয়ার ভাটার প্রকৃতি ও উঠানামার গড়, ৩) সমুদ্র সান্নিধ্য, ৪) মোহনার নিকটবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রস্রোত, ৫) বাতাসের গতি ও দিক, ৬) ভূমির ঢাল, ৭) মৃত্তিকা ও ৮) ম্যানগ্রোভস অরণ্যের অবস্থান ও প্রকৃতি। এদের প্রত্যেক একক বা সামগ্রিকভাবে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নিয়ন্ত্রন করে।

সুন্দরবন এলাকায় জলবায়ুর তিনটি মরশুম চিহ্নি(ত — ১) শুখা মরশুম (প্রাক মৌসুমি, Pre-monsoon) - ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস, ২) বর্ষা মরশুম (মৌসুমি, monsoon) - জুন থেকে সেপ্টেম্বর, ৩) শীত মরশুম - (Post monsoon, মৌসুমি উত্তর) - অক্টোবর থেকে জানুয়ারী।

সুন্দরবনের মুখ্য তিন মরশুমে বাতাসের গড় গতিবেগ যথাত্র(মে মে প্রাক মৌসুমিকালে ঘন্টায় ১১.৫ কিমি.। মৌসুমিকালে ঘন্টায় ১১.১ কিমি আর মৌসুমি- উত্তর কালে ঘন্টায় ৬০/৬৫ কিমি। বৃষ্টির দিনে সংখ্যা যথাত্র(মে - মে মৌসুমিকালে শতকরা ৬৫.৭৯ দিন। প্রাক মৌসুমিতে শতকরা ২০.৩৫ দিন আর সবচাইতে কম মৌসুমি উত্তরকালে শতকরা ১৪.৮১। গত ১০০ বছরে সুন্দরবন অঞ্চলে বছরে গড় বৃষ্টিপাত ১৯০৮ মি.মি. - ১৯৯৩ সালে যা সামান্য বেড়ে দাঁড়ায় ১৯৫০ মি.মি.। আবার সুন্দরবনে বাষ্পায়নের হার বছরে গড়ে ৯৭৭ মি.মি., বাষ্পায়নের তুলনায় বৃষ্টির পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ার দ(ন সুন্দরবন অঞ্চলে নদী জলে লবনতা মৌসুমিকালে অনেকটা হ্রাস পায়। বৃষ্টির কারণে মিষ্টি জলের আধিক্যই সুন্দরবন অঞ্চলে ম্যানগ্রোভস উদ্ভিদের প্রাচুর্যের কারণ। সুন্দরবনের নদীতে জোয়ার ও ভাটার সময় স্রোতের গড় গতিবেগ যথাত্র(মে সেকেণ্ডে ৬৯ এবং ৯১ সেমি। সুন্দরবন অঞ্চলে ঋতুভেদে তাপমাত্রার পরিবর্তন ততটা পরিলি(ত নয়। তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াস থেকে ৩৫° সেলসিয়াস - এর মধ্যেই উঠানামা করে। নদী

নালায় জলের লবনতা সবচেয়ে বেশি হয় প্রাক-মৌসুমিকালে। জলের লবনতা ৭ পি.পি.টি. থেকে ২৭ পি.পি.টি. পর্যন্ত মরশুম অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

বছরের বেশিরভাগ সময় সুন্দরবনের জলবায়ু শান্ত এবং মনোরম থাকে। সাধারণত সুন্দরবনের তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং ২০° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে এবং বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বেশি হয়। বিশেষ করে বর্ষাকালে। তবে আবহাওয়া প্রায় সবসময়ই আর্দ্র থাকে এবং বঙ্গোপসাগর থেকে ত্র(মাগত 40% আর্দ্রতা বহনকারী আর্দ্র বায়ু সহ। অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত। এখানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বাতাস প্রবাহিত হয়। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমা বাস্প বিরাজ করে।

আপনি যদি এই জলবায়ুতে বেড়ে ওঠা ল্যান্ডস্কেপ দেখেন। প্রধানত ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট সুন্দরবন ব-দ্বীপের প্রাথমিক গাছপালা। এটি একটি অনন্য গাছ যা দীর্ঘ সময়ের জন্য প'াবিত জমিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। স্পাইকগুলি তাদের শিকড় থেকে উঠে আসে এবং তারা ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের (বসন এবং সামগ্রিক সহায়তায় সহায়তা করে।

দিন-রাতের আবহাওয়া কাছাকাছি সমুদ্র দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। রাতে একটি শক্তি(শালী শীতল সামুদ্রিক বাতাস থাকে, যা দিনের বেশিরভাগ জলবায়ুকে অনুকূল করে তোলে। সমুদ্রে উচ্চ জোয়ারের সময় সুন্দরবন ব-দ্বীপ প'াবিত হওয়ার সর্বাধিক সম্ভবনা থাকে। তবে একই সময়ে গাছপালা এবং প্রাণীদের জন্য একটি চমৎকার জলবায়ু পরিস্থিতি সরবরাহ হয়।

সুন্দরবনে গ্রীষ্মকাল মার্চ মাসে শু(হয় এবং মে পর্যন্ত চলতে থাকে। গ্রীষ্মকালে এটি সাধারনত খুব গরম থাকে, যখন পারদ ৪২° সেলসিয়াস পর্যন উঠতে পারে। অন্যদিকে এই অঞ্চল শীতকালে খুব শীতল। যখন তাপমাত্রা প্রায় ৯.২° সেলসিয়াসে নেমে আসে। জুনের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে সুন্দরবনে ভারী বৃষ্টিপাত হয়।

সুন্দরবনে ১৫৮২ সাল থেকে ২০০১ সাল অবধি ঘূর্ণিঝড় সহ জলোচ্ছাস হয়েছে ১০৭ বার। সবচেয়ে বেশি ৫ বার হয় ১৯৮৬ সালে এবং ৩ বার করে হয়েছে ১৮৩২, ১৮৭৭ এবং ১৮৮৮ সালে। ঝড়ের তীব্রতার নিরিখে মারাত্মক বিধ্বংসী ঘূর্ণী ঝড়ের প্রকোপ পড়েছে সুন্দরবন ১৯৩২-১৯৩৭ পর্যন্ত টানা ৬ বছর। সাম্প্রতিককালে ১৯৭৬ সালের ঝড় এই অঞ্চলবাসী মানুষের কাছে আজও এক নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা। ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রে জলোচ্ছাসের কারণ। ফলশ্রুতি বন্যা। ১৮৩২ সাল থেকে আজ অবধি বন্যা হয়েছে ১৬ বার। ২০০২ সালের গ্রীষ্মকালে নদীর বাঁধ ভেঙে সম্পূর্ণ প'াবিত হয়েছিল সন্দেশখালির ২টি ব্লক। ১৭৩৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত সুন্দরবনে ভূমিকম্প হয়েছে মোট ৪ বার। রিখটার স্কেলে ভূ-কম্পনের তীব্রতার মাত্রা পর্যাপ্ত ছিল না। তাই ভূমিকম্প সুন্দরবনে সম্পত্তি বা জীবনহানির ঘটনা ঘটেনি।

মানুষ - বন্যপ্রাণ সংঘাত ঃ- সুন্দরবনের সমস্যা মূলত বাঘ ও কুমিরকে নিয়ে। বাঘের সঙ্গে মানুষের দুরকমের সংঘাত হয়। প্রথম প্রকারের মধ্যে থাকে বাঘের নদী পেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়া। একে Tiger Straying বলে। আর দ্বিতীয় প্রকার হল মানুষ যখন জীবিকার প্রয়োজনে বাঘের রাজ্যে ঢুকে পড়ে। এই দুই সংঘাতের (্রে ত্রে (য়(তির পরিমাণ যথেষ্ট বেশি।

বাঘের লোকালয়ে প্রবেশ ঃ- সুন্দরবনে গড়ে প্রতিবছর ১০-১২ বার বাঘ তার নিজের বিচরণ (্রে ত্র ছাড়িয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। অধিকাংশ ঘটনা গোসাবা ও হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে দেখা যায়। এগুলি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত। এছাড়া বাসন্তী, পাথরপ্রতিমা ও কুলতলি ব্লকে ও মাঝে মাঝে বাঘ ঢুকে পড়ে। প্রায়শই বাঘ ঢোকে এরকম গ্রামগুলো হল - হিঙ্গলগঞ্জের সামসেরনগর, কালিতলা হেমনগর, পারঘুমটি,

গোসাবার রজত জুবিলি, দয়াপুর, বালি কুমিরমারী ইত্যাদি। বাসন্তির ঝড়খালি, পাথরপ্রতিমার অধিকাংশ বাঘ নরখাদক হলেও মানুষের খোঁজে গ্রামে ঢোকে না। গৃহপালিত গো(, ছাগল, রাস্তার কুকুর ইত্যাদিকে সহজে পাওয়ার লোভে বাঘ বন পেরিয়ে গ্রামে ঢোকে।

মৌসুমি বর্ষার সময়ে এবং শীতকালে সবচেয়ে বেশি ঘটে। গত ১৫ বছরে দেখা গেছে জানুয়ারি মাস হল সর্বোচ্চ। এর কারণ সম্ভবত ওই সময় বেশি লোক বনে ঢোকে কিংবা শিশু বাঘের বয়স ২-৩ মাস থাকে এবং এর নিরাপত্তার কারণে মা বাঘিনী গ্রামে ঢোকে।

রাতে বাঘ বেশি ঢোকে। বাঘ সাধারণত দিনের বেলায় বিশ্রাম নিয়ে রাত্রে ভ্রমণ করে খাবারের খোঁজে। এই অবস্থায় রাস্তা ভুলে দিকভ্রষ্ট হয়ে গ্রামে বাঘ ঢোকে। যদিও সন্ধ্যের দিকেও বাঘ গ্রামে ঢোকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে দিনের বেলায় এই হার খুবই কম। গত ১৫ বছরে মাত্র ৬টি দিনের বেলায় বাঘের গ্রামে ঢোকার তথ্য রয়েছে।

বাঘের গ্রামে ঢোকার কারণ ঃ- কোন একটি বিশেষ কাবণে সুন্দরনের গ্রামে বাঘ ঢোকার ঘটনা ঘটে না। এর পিছনে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কারণকে দায়ী করেছেন। এই কারণগুলি হল —

* সুন্দরবনের জলকাদা মেশানো বাদাবনে বাঘের খাদ্যের প্রয়োজনে শিকার ধরা হয় কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নয়। বাঘের প্রধান খাদ্য হরিন এবং বন্য শূকর। দৌড়ে হরিনকে ধরা যেমন সহজ ব্যাপার নয় তেমনি ছোট উচ্চতার বন্য শূকরের গুঁতোতে বাঘকে কখনও কখনও পিছু হটতে হয়। অপরদিকে একটি ছোট নদী বা খাল সাঁতরে ওপারে এসে খুব সহজে গো(, ছাগল ইত্যাদির মতো খাদ্য পাওয়ার লোভে বাঘ মাঝে মাঝে গ্রামে ঢোকে।

* বাঘ সাধারণত নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে বা নিজেদের রাজ্যের অধী(ের হিসাবে থাকতে ভালোবাসে। নির্দিষ্ট বনের রাজ্য বাঘের অপর কাউ কে ঢুকতে না দিয়ে নিজের আধিপত্য বজার রাখার ল(্য এই প্রচেষ্টা। কিন্তু বাদ সাধে দৈনিক জোয়ার-ভাটা। সুন্দরবনে দৈদিুক জোয়ারের জল অধিকাংশ দ্বীপকে ডুবিয়ে দেয় আবার জোয়ারের জল নামলে জেগে ওঠে দ্বীপগুলো। তাই অবস্থায় বাঘ সীমানা ছাড়িয়ে পথ হারিয়ে ঢুকে পড়ে অন্যের রাজ্যে কিংবা নদী পেরিয়ে গ্রামে।

* অপরিণত বয়সের বাঘ ও অনেক সময় পরিণত বয়সের বাঘের সঙ্গে লড়াই-এ এলাকা দখল করতে না পারায় জঙ্গলের বর্হিভাগে চলে আসে এবং কোন কোন সময় লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। তাছাড়া কোন কোন জায়গায় গ্রাম ও বনের সীমানা বোঝাও বাঘের প(ে দুঃসাধ্য হয়।

* বৃদ্ধা মা বাঘেদের কিংবা আহত অসুস্থ বাঘেদের প(ে বাদাবনে শিকার ধরা সত্যিই দুরহ। অনেক সময় খাদ্য না পেয়েও না খেয়ে কাটাতে হয় বেশ কিছুদিন। তাদের প(ে নদী পেরিয়ে নদী পাড়ের বাঁধা গো(, রাস্তার কুকুর, ছাগল ধরা অনেক বেশি সহজ। একবার স্বাদ পেলে এ জাতীয় বাঘ বারে বারে ঢুকতে চায় গ্রামে।

* মৌসুমি ঋতুর শেষ পর্যায়ে যখন ধান পাকতে শু(করে তখন ভ্রাম্যমান বাঘ কখনও ধানের জমিকে ঘাসের জঙ্গল কিংবা বাদাবন বলে মনে করে এবং এই ভ্রান্তির কারণে আশ্রয় নেয় ধান জমিতে। এইবার কৃষকেরা মাঠে গিয়ে বাঘ দেখে তাড়াতে গেলে বাঘ দিশেহারা হয়ে ঢুকে পড়ে লোকালয়ে।

* ক্যাট ফ্যামিলির অন্যান্য প্রাণীর মতো বাঘের (ে ত্রেও ছোট শিশু বাঘ বড়োদের খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়। মা বাঘ তাই সর্বদা সন্তানকে ৪-৫ মাস পর্যন্ত আঁকড়ে রাখে অন্যের লোলুপ দৃষ্টি থেকে। দিনের পর দিন স্বাভাবিক শিকার না পেয়ে কোনো কোনো পু(ষ বাঘের এই অস্বাভাবিক ব্যবহার ল(্য করা যায়। মা

বাঘিনীর তখন প্রাণান্তকর অবস্থা নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে সামাল দিতে হয়। তাই কখনও শিশুর নিরাপত্তার জন্য বাঘ নদী পেরিয়ে ধান জমিতে কিংবা ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নেয়।

*** মানুষ ও সম্পত্তির (য়(তি ঃ-** আগেই জেনেছি গ্রামে বাঘ ঢোকে মানুষ মারার জন্য নয় - যদিও সুন্দরবনের বাঘের এক অংশ নরখাদক। সমস্যা হল বাঘের ল(্য মানুষ না হলেও গ্রামের দরিদ্র মানুষের গবাদি পশু। সামনে বাঘ যা পায় তাই মারে। মানুষের তাড়া খেয়ে হয়তো খেতে পারে না। কিন্তু বাঘ গ্রামে ঢুকেছে অথচ পশু হত্যা করেনি এমন ঘটনা নেই বললেই চলে। যেহেতু অধিকাংশ ঘটনা রাতে ঘটে যখন মানুষ মোটামুটি আবদ্ধ জায়গায় ঘুমোয় তাই মানুষের আত্র(ান্ত হওয়ার তথ্যও কর্ম। কিন্তু রাতে বাঘ গোয়ালে ঢুকে গো(হত্যা করার ঘটনা প্রায়শই ঘটে। অভাবে সহজে খাদ্যের জোগান হয় বলে ওই সমস্ত বাঘ বারে বারে গ্রামে ঢোকে। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানার জন্য বর্তমানে বনদপ্তর বাঘকে খাঁচায় ধরে বনে ছাড়ার সময় চিহ্(রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

বাঘের মৃত্যু ঃ- বাঘ গ্রামে ঢোকার সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা হল নীরিহ বাঘের মানুষের হাতে মৃত্যু। গ্রামবাসীরা এই ঘটনা এত সন্তর্পনে করে যে পরে বনদপ্তরে এসে বাঘের লেশমাত্র পায় না। এ জাতীয় ঘটনা সামসেরনগরে কিংবা দয়াপুর, কুমিরমারিতে গত ১৫ বছরে প্রায় ১১ বার ঘটেছে অর্থাৎ ১১ টি বাঘ বন থেকে বেরিয়ে আর বনে ঢুকতে পারেনি।

*** মানুষের বাঘের রাজ্য প্রবেশ ঃ-** সুন্দরবন জৈব সম্পদে পরিপূর্ণ। তাই সেই অতীত কাল থেকে মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে বনে ঢুকেছে। কেউ কেউ অনুমতি নিয়ে। অধিকাংশ লোক অনুমতি না নিয়ে। তাদের একদল মধু সংগ্রহ করে। একদল মাছ ও মীন (বাগদার লার্ভা) সংগ্রহ করে। একদল কাঁকড়া সংগ্রহ করে আর একদল কাঠ ও জ্বালানি সংগ্রহ করে। এরা এককভাবে বা দলগতভাবে জঙ্গলে ঢোকে। অনেক সময় বাঘের মুখোমুখি হতে হয়। নিমেশে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘাড়ে কামড় বসায় ও টেনে নিয়ে জঙ্গলে ঢোকে। এরা নরখাদক বাঘ। মানুষের মাংস খুব পছন্দ । গড়ে প্রতি বছর ৩০-৩৪ জন বাঘে মানুষের সংঘর্ষে মারা যায়। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই কাঁকড়া কিংবা মীন ধরার কাজে ব্যস্ত থাকার সময় এই ঘটনা ঘটে। তাই সংঘাতে মহিলারা বেশি আত্র(ান্ত হয়। বিকেল কিংবা সন্ধ্যার দিকে বাঘের আত্র(মন বেশি ঘটে। গোসাবা, বাসন্তী, হিঙ্গলগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা, কুলতলি, নামখানা, কাকদ্বীপ ইত্যাদি ব্লকের মানুষজন জীবিকার প্রয়োজনে সুন্দরবনে নিয়মিত ঢোকে। তাই বাঘের শিকার।

*** কুমির মানুষ সংঘাত ঃ-** সুন্দরবনে কুমিরে আত্র(মন মানুষের মৃত্যু ও এখন নিয়মিত ঘটনা। সুন্দরবনে মানুষ- কুমিরের সংঘাত নিয়মিত বাড়ছে। আবার জীবিকার সন্ধানে ত্র(মশ বেশি বেশি মাছ ও মিন ধরতে জলে নামছে মানুষ। জলে কুমির খুব শক্তি(শালী। তাই সুযোগ পেলে পায়ে কামড় বসিয়ে টেনে নেয়। পরিণতি মৃত্যু। মিন ধরার ে(ত্রে যেহেতু মহিলারা বেশি নিযুক্ত(। তাই কুমিরের আত্র(মনে মহিলা মৃত্যুর সংখ্যা একটু বেশি। সারাবছরই তাই আত্র(মনের কথা শুনতে পাওয়া যায়। তবে শীত ও গ্রীষ্মকালে মৃত্যুর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। কুমিরের সঙ্গে কামট বা Surf - এর আঘাতেও মৃত্যুর ঘটনা সুন্দরবনের নদীতে, নালাতে ঘটে থাকে। এ জাতীয় আত্র(মন পাথরপ্রতিমা ও কুলতলি ব্লকে বেশি।

প্রভাব ঃ- সুন্দরবনের দুটি জেলা হল দ(ণ ও উত্তর ২৪ পরগণা। এখানকার প্রধান সমস্যা বাঘকে নিয়ে। তাছাড়া কুমির মানুষ সংঘাত ও বর্তমান সময়ে প্রভাব ত্র(মশ ও বেড়ে চলেছে। এখানে বিভিন্ন প্রকৃতির সংঘাত ল(নীয়।

জঙ্গলের বাঘ যখন খাবারের খোঁজে বা অন্য কোন কারণে লোকালয়ে কিংবা ধানখেতে ঢুকে পড়লে এরকম সংঘাত তৈরি হয়। এ(ত্রে শস্য ও গবাদি পশুর (য়(তি বেশি মাত্রায় হয়। মাঝে মাঝে

দুপ(র মৃত্যু হয়ে থাকে। এ জাতীয় ঘটনা Tiger Straying নামে পরিচিত। সুন্দরবনে Tiger Straying ঘটনা বি(খ্যাত।

সুন্দরবন জীব পরিমন্ডল এর ব্যাঘ্র সংর(ত বনাঞ্চল থেকে মাঝে মাঝে বাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়ে এবং গবাদি পশু সহ মানুষ ও বাঘের শিকার হয়। সুন্দরবনে প্রায় ৫ শতাংশ বাঘকে মানুষ খেকো হিসাবে চিহ্নি(ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রজাতির সংঘাত তৈরি হয় যখন জীবিকার সন্ধানে মানুষ জঙ্গলের সম্পদ সংগ্রহ করতে গভীর জঙ্গলে ঢোকে। বর্তমানে সুন্দরবনের অধিকাংশ বাঘ মানুষ খেকো। তাঁই বাঘের এলাকায় বাঘ মানুষকে পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শু(হয় বাঘে মানুষের লড়াই। স্বভাবতই অধিকাংশ (ে ত্রে মানুষের পরিণতি মৃত্যু। কুমির ও তার এলাকায় (নদী, খাঁড়ি, খাল) মানুষজনকে পেলে আর ছাড়ে না। নিমেষের মধ্যে আত্র(মণ করে। অনেক সময় প্রাণ ফিরে পেলেও হাত-পা কাটা পড়ে।

উপসংহার ঃ- সুন্দরবনে বাঘ ও কুমির আছে বলে এখনও সামান্য হলেও সুন্দরবনে টিকে রয়েছে। তাই যে কোনো মূল্যে সুন্দরবনে যে কয়টি বাঘ (২০১৭ সালে বাঘ গনণা অনুসারে ১০৩টি) রয়েছে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সুন্দরবন বাঁচলে পশ্চিমবঙ্গ বাঁচবে। মৎস চাষ করে বহু টাকা অর্জিত হবে। ঝড়-সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কলকাতা ও শহরতলিকে বাঁচাতে এবং সমুদ্রের আগ্রাসন থেকে উপকূলবর্তী অঞ্চল সমূহকে র(া করতে সুন্দরবনের ভূমিকা অপরিসীম। মনে রাখা দরকার পৃথিবীর বাদাবনের মধ্যে কেবলমাত্র সুন্দরবনে বাঘ রয়েছে এবং ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্পগুলির মধ্যে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। শৌর্য বীর্যের প্রতীক এবং অন্য প্রাণীদের আদায়কারী সুন্দরবনের ভয়াল সুন্দর এই প্রাণীটি সুন্দরবনের খাদ্যশৃঙ্খলের শীর্ষে রয়েছে।

বাঁচাতে হবে সুন্দরবনকে, র(া করতে হবে বাঘ সহ তার সমস্ত জীবকূলকে। বনদপ্তরের একক প্রচেষ্টায় এ কাজ কখনই সম্ভব নয়। যদি না গ্রামের মানুষ সমস্ত রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তবে এর সাফল্য বহুলাংশ নির্ভর করছে সরকারি উদ্যোগে এ সকল মানুষদের আর্থিক এবং সামাজিক নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করার ওপর। এ সহজ সত্যটা ভুলে গেলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

জীববৈচিত্র্য

— চঞ্চল আদক, 4th Sem. Geo (H)

ভূমিকা ঃ- খুব সাধারণ ভাষায় বোঝাতে হলে এই পৃথিবীতে হরেক রকম প্রাণীর বাস, একেই জীববৈচিত্র্য বলে। আর বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) হল উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব সহ পৃথিবীর গোটা জীবসম্ভার, তাদের অন্তর্গত জিন ও সেগুলির সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্র।

এককথায় বলতে গেলে মানুষের অবিমৃষ্যকারিতাই জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ। মানুষের হঠকারী কার্যকলাপের ফলে পরিবেশ দূষণ এবং এর ফলে জলবায়ুর দ্রুত (তিকারক পরিবর্তন(কলকারখানা ও বসতি স্থাপন এবং রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রয়োজনে অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংসের কারণ, নদী ও সমুদ্রে শিল্পবর্জ্য নি(প, কৃষি(ত্রে অতিরিক্ত(রাসায়নিক সার প্রয়োগ, চোরাশিকার এ সবই সম্মিলিতভাবে জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি ত্বরান্বিত করেছে।

বৈচিত্র্যময় বাস্তুতন্ত্র ঃ- উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় থেকে দ(নে নিবিড় বাদাবনসঙ্কুল বদ্বীপ আর দীর্ঘ উপকূল, পশ্চিমে লালমাটির দেশ শাল-পিয়ালের অরণ্য, ভারতবর্ষের আর কোনো রাজ্যে নেই পশ্চিমবঙ্গের মতো বাস্তুতন্ত্রের এই বৈচিত্র্য। স্বভাবতই জীববৈচিত্র্যের নিরিখে দেশের অন্যতম শীর্ষে এই রাজ্য। ভৌগলিক মাপে দেশের স্থলভূমির মাত্র 2.7% এই রাজ্যে। অথচ গোটা দেশে যে ১০ প্রকারের জীবভৌগলিক অঞ্চল রয়েছে তার মধ্যে চার প্রকারের অবস্থান পশ্চিমবঙ্গে। এগুলি হল - ১) হিমালয় পর্বতমালা (মধ্য হিমালয়) ২) গাঙ্গেয় সমভূমি (নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা), ৩) উপকূল (পূর্ব উপকূল), ৪) দা(ণাত্যের মালভূমি (ছোটনাগপুর, পু(লিয়া, বাঁকুড়া)। এ রাজ্যে বিপুল জীবজগতে রয়েছে - প্যালিয়ারটিক, ইন্দোমালয়ান এবং অ্যাফ্রোট্রপিক্যাল জীবভৌগলিক উপাদান।

পশ্চিমবঙ্গের বণ্য প্রাণীর আবাসস্থল হ্রাসের কারণ ঃ- ১) মৌচাক উৎপাদনের জন্য বনভূমি নষ্ট(পশ্চিমবঙ্গে ও মৌচাক উৎপাদন একটি গু(ত্বপূর্ণ অর্থনীতি সংত্র(ান্ত (ত্র। এই উদ্যোগে অনেক কোম্পানি বনভূমি নষ্ট করছে এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস করছে। ২) **বন(ত্রে প্রাণীসংখ্যা নির্বাহী পরিযোজনগুলির কারণে হ্রাস ঃ-** কিছু প্রাণীর সংখ্যা নির্বাহি হতে পারে এবং তাদের জনসংখ্যা অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তাদের আবাসস্থল হ্রাস পেতে পারে। একটি উদাহরণ হল পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন বন্য সংর(ন এলাকা, **যেখানে নিম্নলিখিত প্রাণীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ঃ-** বাঘ, বিড়াল, তিতাস, হাতি ইত্যাদি। এই প্রাণীদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাদের আবাসস্থলের হ্রাস হচ্ছে এবং তাদের প্রাকৃতিক জীবনযাপন উদ্যোগ করা কঠিন হচ্ছে। ৩) **বন্য প্রাণী সংর(ণ ও জীববৈচিত্র্য সংর(ণের জন্য সহযোগিতা ঃ-** বন্য প্রাণীর আবাসস্থল হ্রাস রোধ করার জন্য সমগ্র সম্প্রদায় একত্রি হতে হবে। বন্য প্রাণী সংর(ণ ও জীববৈচিত্র্য সংর(ণের জন্য সংস্থা, সরকার, স্থানীয় কমিউনিটি, ওয়ার্ড কমিটি ইত্যাদি পরিচালনা করা যাবে। উদাহরণ স্ব(প, স্থানীয় পরিবেশ সংর(ণ সংগঠন (এফপিও) পশ্চিমবঙ্গে বন্য প্রাণীদের সংর(ণ এবং সচেতনতা কর্মশালা অনুষ্ঠান পরিচালনা করা ৪) **বন্য প্রাণীদের জন্মস্থান নষ্ট ঃ-** কিছু বন্য প্রাণী নির্দিষ্ট জায়গা বা স্থানেই প্রজনন করে এবং তাদের প্রজননের জন্য সমর্থনকারী আবাসস্থল প্রয়োজন হয়। পশ্চিমঙ্গের অনেক উচ্চ ওলাপাথরে চিহ্নি(ত জলাপর প্রদেশগুলি অনেক বন্য প্রাণীর প্রজননের (ত্র হিসাবে গু(ত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, পাহাড়ি প্রানে পশ্চিমবঙ্গের জলাপর প্রদেশে সুন্দরবন সংর(ণ (ত্রের মধ্যে অনেক বন্য প্রাণী জন্ম দিয়েছে। কিন্তু বাড়ি না বাঁচাতে এই প্রদেহের জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের জন্মস্থান নষ্ট হচ্ছে।

ভারতে আঞ্চলিক অসমতা

— ধ্রুবজ্যোতি সরদার, 4th Sem. Geo (H)

প্রস্তাবনা ঃ আধুনিক ভারতে আমরা দেখছি সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক সমতা নিয়ে আঞ্চলিক অসমতা যেন এখানে ত্র(মশ বাড়ছে। এই নিবন্ধে আমরা ভারতের আঞ্চলিক অসমানতা সম্পর্কে আলোচনা করব।

*** ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অসমানতার কারণ ঃ-**

১) আর্থিক অসমতা ঃ উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গের কিছু প্রাদেশিক অঞ্চলে শিকারপুর, কোচবিহার বা সুন্দরবন এলাকায় অর্থনৈতিক প্রস্তুতি সম্পন্ন নয়। এই অঞ্চলগুলোতে উন্নয়নের সময়সীমা দ্রুত চলে যাচ্ছে না এবং সাধারণত তাৎপর্যপূর্ণ বিনির্মান কার্য সম্পাদনে অসম্ভব হয়। এছাড়াও, অসম্ভব ট্রান্সপোর্টেশন এবং উপকরণের অভাবও ওই অঞ্চলগুলোতে উন্নয়নের কারণ হতে পারে।

২) **শি(ার অভাব ঃ** পূর্ব বাংলার কিছু অঞ্চলে প্রাথমিক শি(া সেবা সরকারী স্কুলগুলোর অনুপস্থিতিতে মোটামুটি অবদান করে। কোনও শি(ায় অনুপ্রানিত ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন উচ্চ শি(া প্রাপ্তির সুযোগ পাচ্ছে না, তেমনি উন্নয়নের সুযোগও তাদের সম্প্রসারনের সাথে সাথে হারিয়ে যায়।

৩) **জলবায়ু পরিবর্তন ঃ** মধ্যপ্রদেশের মালভূমি এলাকায় বিপন্ন জলের সমস্যা দেখা যায়। ওই অঞ্চলে সুন্দরবন বন এবং মৎস্য খামার সম্প্রসারণ পেলেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কাঠিন্যতা বিদ্যমান। এইগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের পরিমাণের জন্য ঘটতে পারে, যা বাড়তি সময় এবং শ্রমের প্রয়োজনে করে।

৪) **অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ঃ** পশ্চিমবঙ্গের কিছু প্রাদেশিক অঞ্চলের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নেই, যা মানব বিকাশ ও উন্নয়নের পথপ্রদর্শকে বিঘ্নিত করে। জল সরবাহের অভাব, বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাব, কলা শস্য চাষের জন্য উপযোগী ভূমির অভাব, এই অঞ্চলের অসমান উন্নয়নের কারণ হতে পারে।

৫) আইনের অমান্যতা ঃ অনেক সময় অঞ্চলে আইনের অমান্যতা থাকে যা উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের বাধা হয়। কর্মীর অধিকারের অভাব, দূর্নীতি, সামাজিক ন্যায্যতা ও বিচারের কমতি এই অঞ্চলগুলোতে অসমান উন্নয়নের কারণ হতে পারে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অসাম্যতার প্রভাব

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অসাম্য তার প্রভাব পাওয়া যায় এবং এটি বিভিন্ন সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আয়ামে বিবেচিত হতে পারে। একটি সমাজের অভিজ্ঞতা (অধিক উন্নত ও সুখী হলেও) অস্থায়ী এবং বিপর্যয়শীল হতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

১) আর্থিক অসাম্য ঃ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অসমানতার একটি প্রধান উদাহরণ হল আর্থিক অসমানতা। কেন্দ্রীয় ও প্রদেশীয় সরকারের স্থানীয় আর্থিক নীতি ও বিতর্কী করে থাকলেও, অসমের একটি স্থানীয় উদারনশীলতা এবং উন্নত একটি অর্থনীতি নির্মন করা হয়নি। এটির কারণে অসমের অনেক মানুষ বেকার এবং আর্থিক অস্থিতে পড়ে থাকে।

২) শি(ার অসাম্য ঃ অসমের শি(া প্রতিষ্ঠানগুলি অনেকটাই উন্নত এবং গুনগতভাবে ভালো অবস্থায় রয়েছে। তবে এটি সমগ্র অসমে সমগ্র সমাজকে উপলব্ধি করা যায়নি। এটি সাম্প্রতিক সময়ে পাঠদান সংত্র(ান্ত অসাম্যতার একটি উদাহরণ। অনেকবারই উচ্চ শি(ার জন্য অন্য অঞ্চলে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা

করতে হয় কারণ অসমের উচ্চ শি(া বি(ের বিভিন্ন অংশে অন্যান্য অঞ্চলের সাথে তুলনায়।

৩) লিঙ্গ অসমানতা ঃ ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে অসমানতা একটি গু(ত্বপূর্ণ সমস্যা। অসমের নারীর কলা করতে পারে এবং তাদের অবদান সমাজের প্রগতির জন্য গু(ত্বপূর্ণ। তবে অসমের নারীদের সামাজিক স্থানান্তর ও সমান অধিকারের বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হতে হয়। অসমে নারীদের শি(া, স্বাস্থ্য সেবা, অর্থনৈতিক সমর্থন এবং সামাজিক মন্ডলে অংশগ্রহনে আরও অনুপ্রানিত হতে হয়।

৪) সংস্কৃতিক অসমানত ঃ অসমের সংস্কৃতিক অসমানতা পাওয়া যায় যেমন- ভাষা, সাহিত্য, সন্ধ্য সংস্কৃতিক অভিবামন ইত্যাদি। এটি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সংস্কৃতিক প্রভাবে সম্পর্কিত হতে পারে না। অসমের সংস্কৃতিক ব্যতিত্র(ম আছে এবং অসমের ব্যক্তি(গত, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবগুলি স্বতন্ত্রভাবে পালন করা হয়।

এগুলি কেবলমাত্র কিছু উদাহরন এবং অসমানতার সীমা, সীমানায় পরিবর্তনশীল। অসমানতা একটি সামাজিক সমস্যা যা সমাজের সামরিক ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য বাধা তৈরি করে থাকে। সমগ্র সমাজের উন্নতি ও সমগ্রতার জন্য এই বৈষম্যগুলির সমাধান প্রয়োজন।

পরামর্শ

অসমতা দূর করার জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্পাদিত পরামর্শগুলির উদাহরণ নীচে দেওয়া হল ঃ

১) শি(া প্রশি(ণ ঃ শি(া প্রশি(ণের উন্নতি এমনটি আদিবাসী ও অন্যান্য সামাজিক ভাবনার মানুষের মধ্যে সমান অধিকারের প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ। একটি উদাহরণ হতে পারে মহারাষ্ট্র রাজ্যের Zilla Parishad Schools, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাতৃভাষার শি(া উপলব্ধ করানো হয়েছে।

২) স্বাস্থ্যসেবা ঃ অঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার উন্নতির জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, অনুসন্ধানের জন্য আম্বুলেন্স সুবিধা, ঔষধ সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা অনুষ্ঠান সমুহ সম্পাদিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ রাজস্থানে অনাধিকৃত অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

৩) বীজ প্রযুক্তি(ঃ জৈব বীজ প্রযুক্তি(র প্রচলন সম্পন্ন করে পর্যায়ত্র(মে অসমতা দূর করা যেতে পারে। একটি উদাহরণ হতে পারে আঞ্চলিক ফলনশীল ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য রাজ্যের অঞ্চলে প্রয়োগ করা হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল বীজ প্রযুক্তি(, যা উপাদান ভিত্তিক শস্য চাষ এবং যন্ত্র চাষের উপযুক্ত(।

৪) আদিবাসী ঃ অদ(তা ও অসমতার মুক্তি(পেতে আদিবাসীদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প সম্পাদন করা দরকার। একটি উদাহরণ হতে পারে তবে চট্টগ্রাম মহাকাল সমগ্র উন্নয়ন প্রকল্প, যেখানে চট্টগ্রাম বনভূমির অন্যান্য রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্টিকে শি(া, স্বাস্থ্যসেবা, জৈব বৃ(রোপন এবং বীজ প্রয়োগ সহ প্রাকৃতিক উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

৪) প্রয়োজনীয় পত্র ও সংযোগ ঃ অঞ্চলের অবস্থান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পথ ও সংযোগের উন্নতি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, জম্পিং প্যাডের মাধ্যমে সুন্দরবন রেলওয়ে সংযোগ করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার রাজ্যের মধ্যে। যা আদিবাসী এলাকার সাথে অনুবাদিত হয়েছে।

এগুলি শুধুমাত্র কয়েকটি উদাহরণ এবং অসমতা করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যত্র(মগুলির একটি সন্দর্ভ তৈরি করতে সহায়তা করবে। আরও বিস্তারিত সমস্যার উপর ভিতিত করে উপযুক্ত(পরামর্শ প্রদান করার জন্য আঞ্চলিক প্রশাসন, সরকার, অস্থায়ী বি(বিদ্যালয় ও অন্যান্য সংস্থা সমুহের সাহায্য নেওয়া উচিত।

উপসংহার ঃ ভারতের আঞ্চলিক অসমতা একটি গু(ত্বপূর্ণ ও জটিল সমস্যা। এটি অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামরিক সমগ্রতার প্রতিবন্ধক হিসেবে পরিণত হতে পারে। একটি সমগ্র উন্নতির জন্য শি(া, প্রযুক্তি(, পরিবেশ ও বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক দূর করতে হবে। এছাড়াও সমন্বয়পূর্ণ নীতি, সুযোগের সমতা ও ন্যায্যতা বিশেষ গু(ত্ব পায়। সমগ্র উন্নতির পথে সরকার ও সমাজের মধ্যে সমন্বয় এবং সহযোগিতা প্রয়োজন যাতে সকল অঞ্চলে উন্নতি ও সামরিক সমগ্রতা সম্ভব হয়।

পরিবেশ দূষন ও বি্বেউষ(ায়ন

— (পাল গায়েন, 6th Sem. Geo (H)

" হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী, দাও সেই তপবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি।"

এই সভ্যতা মানুষকে করে তুলেছে পরিভোগমুখী, উচ্চাভিলাসী, আসাকেন্দ্রীক ও স্বার্থ সর্বত্ব। মানবিক জীবন থেকে মানবিকতাবোধের অবসান হয়েছে। মানুষ হয়ে উঠেছে আরো বেশি যান্ত্রিক।

আজকাল বাড়িই হয়ে উঠেছে নতুন অফিস, ইন্টারেনট হল নতুন অফিসক(। কিছু সময়ের জন্য নিজের সহকর্মীদের সাথে কাজ করা, আড্ডা দেওয়া একসময় দুর্বোধ্য (covid) বিষয় ছিল।

বর্তমান-এ দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে চলছে ভয়ঙ্কর রকমের পরিবেশ দূষণ। যা তাপমাত্রা বাড়ার প্রধান কারণ। কিছু বছর পূর্বে দাবানলে পুড়ে ছাই হয়েছে পৃথিবীর ফুসফুস আমাজন। এবার তাপদহ, দাবদহে পুড়ে ফ্রিশফ্রাই হতে চলেছে পুরো পৃথিবী। কারণ অবাধ বৃ(চ্ছেদন, দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়ন বৃদ্ধি, CFC গ্যাসের অতিরিক্ত(ব্যবহার ও জীবা(ম জ্বালানির ব্যবহার, জনবিস্ফোরণ যা পরো(ভাবে বি(ব উষ(ায়নের সহায়ক হয়েছে।

এর ফলে পরিবেশের উপর ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ছে - গ্রীষ্মকালে তাপপ্রবাহের সংখ্যা বাড়ছে। বৃষ্টিপাতের বন্টনের সামগ্রিক পরিবর্তন হচ্ছে, হিমাবহ গলন, সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি, কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন হচ্ছে, দাবানল বৃদ্ধি পাচ্ছে, রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এছাড়া - এল নিনোর প্রভাবে যেখানে দ(িণ প্রশান্ত মহাসাগরে শীতল স্রোতের পরিবর্তে উষ(স্রোতের ফলে জেট বায়ু দু-ভাগ হয়ে পড়ায় প্রত্যয়নকারী মৌসুমি বায়ু কিছুটা দূর্বল হয়ে ভারতবর্ষে দেরিতে প্রবেশের ফলে খরা সৃষ্টি হচ্ছে। সস্তা শ্রম এবং বেলাগাম দূষণ বি(ায়নী উদারনীতির 'উন্নয়ন' এর এটাই ছিল প্যাকেজ ডিল। 'উন্নয়ন' এর চমকানিতে ভারত, বাংলাদেশ, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার মতো বিভিন্ন দেশে অরণ্যের পর অরন্য হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। খনিজ সম্পদে ভরা পাহাড় বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। একদিকে খরায যখন ভূ-ভারত হেঁচকি তুলে মরেছে তখন নদীর জল বহুজাতিক পানীয় কোম্পানি বোতল ধুয়েছে। আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে 'উন্নয়ন' - আমাদের চোখ রাঙিয়ে ঝকঝকে ভারত চিনিয়েছে। উন্নয়নের হাওয়াতে দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের ফুসফুস ভরেছে বিষাক্ত(ধোঁয়ায়।

তাই এই দূষন এবং পরিবেশের উষ(তা কমানোর জন্য কিছু পদ(েপ গ্রহন করা যেতে পারে যেমন গণপরিবহনের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ব্যক্তি(গত গাড়ি ব্যবহারের পরিবর্তে হাঁটা, সাইক্লিং গণপরিবহনের ব্যবহার মানুষকে ফিট রাখতে সাহায্য করবে। এছাড়া দূরে ভ্রমণ এর (েত্রে উড়োজাহাজের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক বাহন ব্যবহার ক(ন বা ট্রেন যাত্রাকে বেছে নিন।

শক্তি(র অপচয় রোধ ক(ন ঘরকে ঠান্ডা করতে এসির তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বা তার এর চাইতে বাড়িয়ে রাখুন এবং ঘর গরম করতে হিটারের তাপমাত্রা কমিয়ে ব্যবহার ক(ন। এমনই এক তথ্য শেয়ার করলেন বিবিসি নিউজ বাংলা।

মাংস খাওয়া কমিয়ে নিরামিশভোজী হয়ে যান এমনই তথ্য শেয়ার করলেন প্যারিসের এক জলবায়ু সম্মেলনে। যেখান বলা হয়েছে মুরগির মাংস, ফল, শাক সব্জি বা শস্যের উৎপাদনের চেয়ে লাল মাংসের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন ঘটায়। যদি এটি চ্যালেজিং মনে হয়, তাহলে সপ্তাহে অন্তত একদিন মাংস না খেয়ে কাটান।

'আরোমার রেভির মতে - প্রতিটি জিনিস পুনর্ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে এমন কি জলও। আমাদের বারবার পুর্নব্যবহারযোগ্য করতে যে উপকরণ লাগে সেটার পরিবহন এবং প্রক্রি(য়াকরনে প্রচুর পরিমাণে কার্বনের ব্যবহার হয়।

তারপরেও একটি নতুন পণ্য তৈরির চেয়ে কম শক্তি(ব্যবহার করে। কিন্তু পণ্যগুলো পুনঃব্যবহারের ফলে আরও নানা (য়(তি কমানো যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি সবদিকে ছড়িয়ে দিন এবং সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে শি(ত করে তুলুন। একটি টেকসই কমিউনিটি জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যদের মতো এক হয়ে কাজ করা প্রয়োজন। (অরোমার রেভি)

বি(্ব উষ(ায়ন পৃথিবীর এক গভীর অসুখ। এর থেকে মুক্তি(র উপায় সচেতনতা, পরিবেশ শি(া, প্রচার মাধ্যম ও একটি সুন্দর মানসিকতা। শুধুমাত্র ৫ই জুন বি(্ব পরিবেশ দিবস পালন করলে হবে না। প্রত্যেকদিন প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। পরিবেশবিদদের সতর্কবার্তা মনে রেখে গ্রীনহাউস গ্যাসের উৎস বন্ধ করতে। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়ে পরিবেশকে দূষণমুক্ত(রখতে হবে।

ভারতে নারী শি(ার সমস্যা ও সমাধান

— কথা বর, 6th Sem. Geo (H)

সমাজিক উন্নতিতে নারী শি(ার গু(ত্ব অসীম। ''পাখি যেমন একটি ডানা নিয়ে উড়তে পারে না'', ঠিক তেমনি সমাজ কখনোই উন্নতির পথে এগোতে পারেনা নারী শি(া ছাড়া। ''নারী জাতি এখনোও দ্বিতীয় শ্রেণির / মানুষ হিসাবে বিবেচিত, এমনটি / হলে সমাজ সার্বিক উন্নতি / কখনও সম্ভব নয়'' - ঈ(রচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

নারী শি(ার সমস্যা ঃ এদেশের অধিকাংশ অভিভাবক কন্যার শি(ার অপে(া পুত্রের শি(ার উপর অনেক বেশি গু(ত্ব দেন। Table No.1, Enrolment of Boys and Girls.

Class	Government School		Private School	
	Girls	Boys	Girls	Boys
1-4	50.5	49.5	44.44	55.53
5-8	51.27	48.73	44.71	55.29
9-12	50.76	49.24	44.56	55.44

Source : U-DISE (2016-17)

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পু(ষের তুলনায় নারীর সম্মান ও মর্যাদা অপে(াকৃত কম। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আইন থাকলেও বহু(ত্রেই আইন মানা হয় না। বিয়ের পর আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়না প্রায় সব মেয়েদের। গ্রামের অধিকাংশ মহিলারা নির(র(কুসংস্কার(ফলে মেয়েদের লেখাপড়ার বিষয়ে গু(ত্ব দেয় না। সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে নারী শি(ার ব্যাঘাত ঘটছে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে পাঠাগারের অভাবে নারী শি(ার ব্যাহত। আর্থিক অনটন নারী শি(ার (ে ত্রে ব্যাঘাত ঘটছে। ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যত্র(ম এর ফলে বেশির ভাগ মেয়েদের অর্জিত বিদ্যাকে পরবর্তী জীবনে কাজে লাগাতে পারে না। ভারতে অনেকেই এই মত পোষণ করেন যে উচ্চশি(িত মেয়েরা সাংসারিক শৃঙ্খলা চাননা। উপযুক্ত(শি(কের অভাবে নারী শি(ার ব্যাহত হচ্ছে।

নারী শি(ার সমস্যার সমাধান ঃ মেয়েদের শি(া বাধ্যতামূলক করা। স্কুল কলেজে মহিলা শি(ক নিয়োগ করা যাতে অভিভাবকেরা কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহী হন। গ্রামের বালিকাদের স্কুলে যেতে উৎসাহি করা। এর জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা। নারী শি(ার পাঠত্র(মে কিছু পরিবর্তন আনা দরকার যেমন - শিশুদের লালন-পালন, নারীদের শারীরিক গঠন ভালো, মন্দ জ্ঞান ইত্যাদি। অভিভাবকদের নারী শি(া সম্পর্কে সচেতন করা। সামাজিক শি(ার মাধ্যমে সমাজের বয়স্ক নির(র মহিলাদের সা(র করে তোলা। নারী শি(ার জন্য দূরত্বের কথা মাথায় রেখে পাঠাগার, পাঠ্যসূচি তৈরী করা। বিদ্যালয়ে নারীদের আইন সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে নারীদের জানানো। নারী শি(ার জন্য নারীদের নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে। ভারতের বিভিন্ন সমস্যাগুলি অতিত্র(ম করে ভারতের প্রথম নারী কাদম্বিনী বসু গাঙ্গুলি (১৮ জুলাই ১৮৬১ — ৩ অক্টোবর ১৯২৩)। তিনি আধুনিক চিকিৎসার ডিগ্রি নিয়ে অনুশীলন করেছিলেন।

''চিন্তা যে ভরশূণ্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত(,
যেথা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গনতলে দিবস
শর্বরীর সুধারে রাখে নাই খন্ড (দ্র করি'' — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিলং ঃ একটি ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

— রচনা বর, 6th Sem. Geo (H)

ভূগোল হল একটি খুবই আকর্ষনীয় বিষয়, যার মধ্যে আমরা পুরো বি(ব্রহ্মান্ড সম্বন্ধে জানতে পারি। সুতরাং একজন ভূগোলের ছাত্রী বা ছাত্র হিসাবে ভূগোল সংত্র(ান্ত বিষয়টি আরো বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

সেই উত্তেজনার টানে আমরা বেরিয়ে পড়ি ''মেঘের আলয়, মেঘালয়ের'' এর উদ্দেশ্যে। আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল মেঘালয়ের একটি ছোট্ট শহর শিলং এর দিকে। মেঘ দিয়ে ঘেরা মেঘালয় ও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যতা বারবার আমাদেরকে তার দিকে টানছিল।

নভেম্বরের এক সুন্দর সকালে বেরিয়ে পড়ি তারিখটি ছিল ৯ই নভেম্বর, ২০২২। সমস্ত বন্ধুরা একসঙ্গে দেখা করে হাওড়া স্টেশানে এর উদ্দেশ্যে রওনা হই। তখন সমস্ত বন্ধুদের মুখেই ছিল এক আলাদা উত্তেজনা। তো যথারীতি আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাই। আমাদের ট্রেন ছিল ৩-৪৫ এ (সরাইঘাট এক্সপ্রেস, হাওড়া - গুয়াহাটি ট্রেনে ওঠার আগে আমরা আমাদের দুপুরের খাওয়া ও সেরে নিই স্টেশনে। তারপর আমরা আমাদের শি(কদের সঙ্গে দেখা করে ট্রেনে উঠে গুয়াহটির পথে রওনা দেই। তারপরই শু(হয় আমাদের আসল মজা। খুব মজা করি সবাই এক জায়গায় বসে আড্ডা মারি, চা ও কিছু জল খাবারের সাথে। তারপর আমরা আমাদের রাতের খাবার খেয়ে আরো কিছু সময় আড্ডা মেরে ভাবলাম ''এবার একটু শোয়ার প্রয়োজন''। তারপরদিন অনেক ভোরেই ঘুম ভেঙে দেখি এক অদ্ভুতপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য যা আমাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে। দেখি আমাদের ট্রেন ছুটে চলেছে। ছোট ছোট টিলারী মাঝে শিশিরে ভেজা জমির ওপর দিয়ে যার ওয়ার সূর্যের হালকা ছিটে পড়েছে। এরপর সকাল সকাল আবার আড্ডা জমাতে আমাদের সময় লাগেনি। এভাবেই আমরা আড্ডা মজার মধ্যে গুয়াহটিতে পৌঁছাই। দীর্ঘ ট্রেন জার্নির পর গুয়াহাটি সেটশনে আমরা গাড়ি ঠিক করার সময় কিছু(ণ অপে(া করলাম এবং কিছু ছবিও তুললাম। তারপর আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম পরবর্তী গন্তব্যস্থান শিলং-এর জন্য। যখন আমরা মেঘালয়ের মধ্যে ঢুকলাম সত্যি ওই রাস্তার সৌন্দর্যতার মধ্যে এক আলাদাই অনুভূতি। তো রাস্তার মধ্যে একটা হোটেল এ গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা কিছু(ণ চা জল খেলা। তারপর আবার আমাদের গাড়ি চলতে শু(করল। আমরা অবশেষে পৌঁছালাম শিলং। তখন একটা খুবই হালকা ঠান্ডার অনুভূতি হল। এতটা জার্নির পরও কারো মুখে তখন এতটুকু ক্লান্তির ছাপ নেই। সবাই মুখে তখন এক আলাদাই আনন্দ। নতুন জায়গা পরিদর্শনের। তো গাড়ি থেকে শিলং মার্কেট - এ নেমেই একটু হেঁটেই আমাদের হোটেল। হোটেলে গিয়ে সবাই ফ্রেস হয়ে। দুপুরের খাবার সারতে সারতে বিকাল হয়ে যায়। তারপরই আবার বেরিয়ে পড়ি নতুন জায়গা পরিভ্রমণে। Police Bazar হল শিলং এর এক বিখ্যাত মার্কেট। আমরা এর পাশেই ছিলাম। তো যথারিতি আমরা বাজারটা খানিকটা ঘুরে দেখলাম। আর প্রথমদিন গিয়েই কিছু কেনাকাটা ও করে ফেলি। তারপর হোটেলে এসে সবাই একজায়গায় আড্ডা মারতে বসি চায়ের সাথে। এই ভাবেই আমাদের শিলং-এ প্রথম দিনটা কাটে।

দ্বিতীয় দিনটি ছিল আমাদের সার্ভে এর দিন। স্যাররা আমাদের সেটি আগেরদিন রাতেই জানিয়ে দেন। তো আমরা সকাল সকাল উঠে সবাই রেডি হয়ে আমরা সার্ভের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত tools এবং

কিছু geography -এর instrument নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। আমাদের study area ছিল "East Khasi Hill District -এর সেখানে পৌঁছানো মাত্রই দেখি এক সুন্দর জমির (ে ত। সেখানে বিভিন্ন সব্জি, গম প্রভৃতি চাষ হচ্ছে। সেটি অনেকগুলি পাহাড়ের মাঝের খানিকটা স্থান জুড়ে রয়েছে। তারপর আমরা প্রকৃতির মজা নিয়ে আমাদের করণীয় কাজ শু(করি। প্রথমে আরমা সবাই গ্রুপ ছবি তুলি। তারপর নিজেরা কতগুলি দলে বিভক্ত(হয়ে সার্ভের কাজে বেরিয়ে পড়ি। নতুন জায়গায় নতুন নতুন মানুষের মধ্যে সার্ভে করতে গিয়ে অনেক সুন্দর অভিজ্ঞতা ও কিছু মজার মজার ঘটনাও ঘটেছিল। ওখানে বেশিয়ভাগই ছিল খাসি সম্প্রদায়ের মানুষ। যার মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই খাসি ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় বোধগম্য নয়। তো তাদের সঙ্গে কথপকথন করতে গিয়ে বেশ কিছু মজার পরিস্থিতি তৈরি হয়। সব শেষে এটা বলা চলে ওখানকার মানুষজন খুবই সহজ ও সাধারণ। স্যারের কথামত একটা সময়ের পর আমরা আবার একজায়গায় হই। এবং সেটা ছিল নর্থ-ইস্ট হিল ইউনিভার্সিটি। যার পরিবেশ ছিল মনমুগ্ধকর। সেখানে গিয়ে মনে হচ্ছিল যেন বোটারনিক্যাল গার্ডেনে এসেগেছি। ইউনিভার্সিটি -র লেক এ খেলা করছিল প্রচুর রঙবেরঙিন মাছ। এছাড়া ছিল সেন্ট্রাল লাইব্রেরী। সব মিলিয়ে NEHU-র পরিবেশ ছিল অপূর্ব। তারপর আমরা আমাদের আরো কিছু Geographical কাজ সেরে হোটেলে ফিরে আমরা আমাদের লাঞ্চ কমপি-ট করেই আবার আমরা বেরিয়ে পড়ি Ward's Lake -এর উদ্দেশ্যে।

Ward's Lake ঃ এই লেক-এর স্থানীয় নাম হল Pollock Lake Or Nan Polok এটি হল একট কৃত্রিম হ্রদ। এটি শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত। শিলং এ সবচেয়ে বেশি দর্শনীয় স্থান এটি। এখানেই অনুষ্ঠিত হয় ভারতের সবথেকে বড়ো Cherry blossom fastival। আমাদের এই Geographical Work - এ আমাদের স্যারের এক বন্ধু যিনি NEHU তেই Ph.D. করছেন। তিনিও আমাদের অনেক সাহায্য করেন এবং Ward's Lake ঘুরে দেখতেও সঙ্গ দেন। তারপর আরো কিছু সময় বাজারে ঘরে (ম এ এসে ফ্রেস হয়ে সবাই মিলে ডিনার করে গল্প করতে বসি। এই ভাবেই শেষ হল দ্বিতীয় দিনটা।

পরদিন খুবই সকাল সকাল রেডি হয়ে নেই এশিয়ার Clearnest Village এবং আরো কিছু Interesting Place দেখার জন্য সবাই হোটেল থেকে বেরিয়ে বাইরে চা খাই তারপর গাড়িতে উঠি। দুটো গাড়ি হয় স্যাররা আমাদের সঙ্গেই একই গাড়িতে ওঠেন। Clearnest Village যাওয়ার পথে আমরা একটা view point দাড়াই এবং তার স্নিগ্ধ সুন্দরতার মজা নেই এবং কিছু ছবি তুলে আবার গাড়িতে চাপি সোজা এসে দাড়াই living root bridge এর স্পট এ। যা ছিল পুরো সবুজে ঘেরা এক সুন্দর জায়গা।

living root bridge ঃ এটি হল এক ধরণের সরল সাসপেনশন ব্রিজ যা গাছের আকারের মাধ্যমে জীবন্ত উদ্ভিদের শিকড় দিয়ে তৈরি। root bridge এ দেখতে বেশ অনেকটা নীচে নামতে হয়। নামতে তো বেশ ভালোই লাগে। সেখান থেকে ওঠার পর সবাই খুব শক্তি(হারিয়ে ফেলে। সেই দেখে এজেন্ট চিহ্(কে আমাদের একটু শক্তি(র দরকার। তাই মাঝ রাস্তায় জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের ভুড়িভোজ সারি। তারপর আমরা সোজা চলে যাই এশিয়ার Clearnest Village Maulynnong । জায়গাটা খুবই সুন্দর এবং মনোরম আর খুবই পরিষ্কার যা বলাবাহুল্য এখানেই কিছু উচু বাঁশের কেলা মতো ছিল যার ওপর দিয়ে বাংলাদেশ দেখা যায়।

Maulynnong ঃ মাওলিনং পূর্ব খাসি পাহাড়ের একটি গ্রাম। এটি তার পরিচ্ছন্নতার জন্য উল্লেখযোগ্য এবং ডিসকভার ইণ্ডিয়া ম্যাগাজিনে এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম হিসেবেও এটিকে বেছে নিয়েছে। সেখান থেকে আমরা যাই আমাদের তৃতীয় দিনের শেষ ভিজিটিং পে-স ডাওয়াকি। ডাওয়াকি পৌঁছাতে

পৌঁছাতে আমাদের বেশ বেলা গড়িয়ে যায়। তাই এশিয়ার Clearnest Village টার খুব ভালো মজা নিতে পারিনি। তবে এখানে যাওয়ার সময় আমার বেস্ট পার্ট লাগে আমারা বাংলাদেশের বর্ডার এর পাশ দিয়ে যাই এবং একটা জায়গায় আমরা কিছুটা জায়গা বাংলাদেশের মধ্যেও ঢুকি। সেটাকে পার করে যাওয়া আসা করতে হয়। তবে এখানে যে মানুষগুলো থাকে তাদের খুব সমস্যা যেমন - কেউ অসুস্থ হলে তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার যেমন বাজে রাস্তা। তেমন কোনো ঠিকঠাক যোগাযোগ র(ার ব্যবস্থাও নেই। তো ওখান থেকে ফিরতে আমাদের অনেক রাত হয়। তবুও আমরা ফিরে একটু বাজার ঘুরি। তখন প্রায় সব বন্ধ হয়ে গেছে সব প্রায় ফাঁকা। তারপর হোটেলে ঢুকে বন্ধুরা মিলে আড্ডা সেরে। ডিনার কমপ্ি-ট করে তৃতীয় দিনকটাকে বিদায় জানাই।

বিদায় জানানো দিয়ে মনে আসল। আমাদের শেষ দিন শিলং এ। চতুর্থ দিন আজ। সকাল বেল রেডি হয়ে বেরিয়ে পরি চেরাপুঞ্জির উদ্দেশ্যে। চেরাপঞ্জির বেস্ট পার্ট ছিল তার রোড ভিউ যা ছিল অসাধারণ। আমরা পর পর দুটো ভিউ পয়েন্ট এ দাঁড়াই। যার মধ্যে একটা ভিউ পয়েন্ট হল Noh Sngithand falls বা seen sister falls।

Noh Sngithand falls ঃ ৩০০ মিটার এই ফলস টি হল খুবই আকর্ষণীয় ভারতে এবং মেঘালয়ে। এটি চুনপাথর দ্বারা গঠিত। এটিকে seen sister falls বলার কারণ হল - জলপ্রপাতের সাতটি অংশ উত্তর-পূর্বের সাতটি বোন রাজ্যের প্রতীক। সেগুলি হল আসাম, অ(ণাচলপ্রদেশ, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মেঘালয়। জলপ্রপাতটি বিভিন্ন জলপ্রপাত এর সমন্বয়ে গঠিত। তারপর সেখান থেকে আমরা সোজা চলে যাই Mawsmai Cave। সেখানে ঢোকার পথটাই ছিল বেশ ইন্টারেস্টিং।

Mawsmai Cave ঃ গুহাটি হল চুন আর বেলেপাথর সমৃদ্ধ গুহা। পর্যটকদের জন্য মাত্র ১৫০ মিটার অংশই খোলা থাকে। এখানে স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইটস - এর গঠন আপনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করবে। সবশেষে আমরা চলে যাই Arwah Cave। সেখান থেকে পাহাড় ও শহরের দৃশ্যটাই ছিল অসাধারণ। আমরা সেখানে মৃদু ঠান্ডার মধ্যে বেশ জমিয়ে নুডলস ও খাই। তারপর হোটেলের দিকে রওনা দেই। হোটেলে এসে একটু ফ্রেস হয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পরি প্রথমে আমরা চা খাই তারপর শেষ দিন বলে একটু কেনাকাটা। স্যারাও যান আমাদের সঙ্গে আমরা অনেক রাত পর্যন্ত থাকি স্যাররাও আমাদের সঙ্গে ঘোরেন। আমরা ওখানকার স্পেশাল কাঁচা সুপারি ও নারকেল দেওয়া পানও খাই। মার্কেট এর মাঝখানে আমরা দাঁড়িয়ে গানও করি। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা ছিল পুরো ফাটাফাটি। এইভাবেই চতুর্থ দিনটা কেটে গেল।

পরদিন সকালে উঠে শিলং-এ কাটানো দিনগুলো কত তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেল ভাবতে ভাবতেই আমাদের রেডি হয়ে বেরনোর সময় হয়ে গেল। এবার শিলং-কে বাই বাই বলে। রাস্তার দুই পাশে চেরি ব্লসম এর সঙ্গে সঙ্গে এগোতে থাকলা আসাম এর দিকে। সবার মন একটু ভারাত্র(ান্ত ছিল। তারপর সবাই সবার মন ঠিক করে আসামের হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম গুয়াহটি কামা(া মন্দিরের দিকে। মন্দিরে ঢোকার আগে কিছু ডালা কিনে ঢুকেই দেখি মাথা খারাপ ভিড়। তাই দেখে আমরা গ্রুপের ছেলেদের হাতে ডালা ধরিয়ে আমরা মন্দির পরিদর্শন এ বেরিয়ে পরি। বসেও আড্ডাও মারি। তারপর আবার হোটেলে ফিরে চা-এর জন্য বেরোই। গুয়াহাটি জায়গাটা ঠিক ভালোলাগার মতো নয়। তারপর হোটেলে এসে ডিনার সেরে সবাই জমিয়ে আড্ডা মারতে বসি। স্যাররাও ছিলেন। সবাই সবার Experience।স্যাররা তাদের পুরানো কথা বলেন। আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল গোপালদা (নন টিচিং স্টাফ) আর আমদের কঙ্কন

স্যার, যে খুব কমই হাসে, তো আমাদের এই ঘোরা মধ্যে একটা ঘটনা নিয়ে খুব হাসাহাসি হয় যখন স্যার খুবই হাসে দেখে আমাদের সবার খুব ভালো লেগেছিল। এই ভাবেই হাসি আড্ডার মধ্যে দিয়ে আমাদের শেষ দিনটা কেটে যায়।

আমাদের Excursion এর শেষ সকালে এজেন্ট খুবই বাজে ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিন শু(করে। যদিও বিগত দিনগুলিতে আমাদের রাত্রে খাবার খেয়ে কাটাতে হয়েছিল তো যাই হোক আমরা রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়ি গুয়াহাটি স্টেশন এর দিকে রওনা দিই তারপর চেপেবসি ট্রেনে এবং একদিকে যেমন বাড়ি আসার আনন্দ ছিল ঠিক তেমনই ছিল শিলং-এর সুন্দর মনমুগ্ধকর পরিবেশ ছেড়ে আসার কষ্ট এবং আমরা নিজেরা আড্ডা মারি এবং এভাবেই সন্ধ্যা হয়ে যায় এবং আমাদের এজেন্ট আমাদের যে খাবার দেয় তা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় ও এই বিপদের মাঝে আমাদের স্যার আমাদের খাওয়ার আয়োজন করে যাতে স্যারের স্ত্রীর অবদান অনস্বীকার্য। স্যারের স্ত্রী আমাদের বড় দিদির মতো ছোটো ছোটো ভাইবোনেদের জন্য (টি আর মাংস ও সাথে মিষ্টি যা খেয়ে আমাদের মন ও পেট উভয় ভরে যায়। তাই কথায় আছে যার শেষ ভালে তার সব ভালো - ঠিক তেমনই আমাদের এজেন্ট এর ব্যবহার ও পরিষেবা ছাড়া সবই ভালো ছিল এবং সবথেকে খারাপ লাগার ব্যাপার এটাই আমাদের রান্নী ও তার সাহায্যকারী সেই দুইজন মানুষই ছিল বয়স্ক এবং এজেন্ট এদেরকেও খুবই বাজে ভাবে রেখেছিল। সবশেষে আমরা সবাই নিজেদের বাড়ি পৌছাই। এই পুরো Excursion টাই ছিল খুবই রোমাঞ্চকর যা আমাদের জীবনে একটা মূল্যবান স্মৃতি হয়ে থাকবে।

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য

— (মানা পারভীন, 6th Sem. Geo (H)

এখন থেকে ১ লাখ বছরের আগেও দ(িণ এবং দ(িণ পূর্ব এশিয়ার পুরোটাই জুড়ে ছিল গহীন জঙ্গল। আনুমানিক ৭০-৮০ হাজার বছর আগে এই এলাকায় প্রথম আদি মানুষের বসবাস শু(হলে ধীরে ধীরে সেই জঙ্গলের আয়তন সংকুচিত হতে থাকে। যার আগে পর্যন্ত বি(ের বৃহত্তম জঙ্গল ছিল দ(িণ এশিয়ায়, যদিও বর্তমানে এই খেতাব দ(িণ আমেরিকার আমাজন জঙ্গলের মাথায় উঠেছে। যাই হোক সুপ্রাচীন এই জঙ্গলের বিশাল একটি অঞ্চলের অবস্থান ছিল ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের সংলগ্ন উপকূল এলাকায় প্রাকৃতিক কারণেই উপকূলীয় এলাকায় জঙ্গলের চেহারা ত্র(ান্তীয় বনের বদলে ম্যানগ্রোভ বনে পরিণত হয়।

এই ম্যানগ্রোভ বনের বৈশিষ্ট্য এই বনের উদ্ভিদগুলি দিনে একাধিক কারণে সমুদ্রের জলে ডুবে থাকে। দ(িণ ও দ(িণ পূর্ব এশিয়ার উপকুলীয় এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই ম্যানগ্রোভ বনের খন্ডিত কিছু অংশ এখনও টিকে আছে। ভারতের তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত ম্যানগ্রোভ বন দুটি সেই ভগ্নাংশ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিলুপ্ত প্রায় সেই সুপ্রাচীন ম্যানগ্রোভ কাটিয়ে থাকা সবচেয়ে বড়ো অংশটির নাম সুন্দরবন। বাংলাদেশের দ(িন অঞ্চলে এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দুটি জেলা মিলিয়ে বিস্তৃত এই বনটি এখনও বি(ের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনের খেতাব ধরে রেখেছে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ও দ(িণ ২৪ পরগণা দুটি জেলা মিলিয়ে বিস্তৃত বি(ের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় ১০ হাজার বর্গ কিমি. এর শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ বা

৬ হাজার বর্গকিলোমিটার বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রনাধীন রয়েছে এবং বাকি ৪০ ভাগ বা ৪ হাজার বর্গ কিলোমিটারের মতো এলাকা ভারতে নিয়ন্ত্রনাধীন রয়েছে। জমি মাপজোগের প্রচলিত এককের হিসাবে সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ২৫ লাখ একর। এই সুন্দরবনের সীমানা দুটি নদীতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পূর্বদিকে ভারতের হুগলী নদী পশ্চিমে বাংলাদেশের পলে(র নদ। এই দুটো জলধারার মধ্যবর্তী ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের আনুষ্ঠানিক নাম সুন্দরবন। এই সুন্দরী নামক এক ধরণের গাছের নাম অনুসরণ করে সুন্দরবনের নাম রাখা হয়েছে। উত্তরের হিমালয় পর্বত মালা থেকে নেমে আসা গঙ্গ, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা এই তিনটি জলধারার মোহনা এই সুন্দরবন এলাকায় অবস্থিত। সুন্দরবন নামক বনাঞ্চলের উপর কৃতিত্ব বিট্রিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দখলে আছে।

সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য নিয়ে কথা বলতে গেলে অবধারিত ভাবে যে প্রাণীটির কথা বলতে হবে সেটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এদের গড় ওজন ২০০- ২৫০ কেজি। এরা বন্য শূকর, হরিন এবং মহিষ এর মতো প্রাণী শিকারের মাধ্যমে জীবনযাপন করে। বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী পুরো দ(িণ এশিয়ায় আনুমানিক ২৫০০ হাজারের মতো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আছে। এর শতকরা ১০ ভাগই সুন্দরবনে বসবাস করে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের পাশাপাশি সুন্দরবনের বাসিন্দা বন্য প্রাণীদের মধ্যে রেসাস বানর, চিতল হরিণ, ধূসর মাথা মোছা ঈগল পাখি, নিল মাছরাঙা, নোনা প্রাণীর কুমির এবং করাত মাছ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ইরাবতী ডলফিন নামক প্রজাতির জলজ স্তন পায়ী প্রাণীরাও সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদী নালায় বসবাস করে। তবে নদী-নালা দূষণের কারণেই এদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে বাঘের মতো এই বনে বসবাসকারি অনেক জীবজন্তুর মধ্যে চিতল হরিণের অস্তিত্ব ও হুমকির মধ্যে রয়েছে। এক সময় পুরো সুন্দরবনে কয়েক লাখ হরিণ ঘুরে বেড়ালেও বর্তমানে সংখ্যা কমে গিয়ে ৩০ হাজারে নেমে গিয়েছে। আর এই বনাঞ্চল থেকে এর মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীর তালিকায় রয়েছে নাম এক প্রজাতির সিংবিহীন গন্ডার।

গঙ্গা- ব্রহ্মপুত্র - মেঘনার বদ্বীপের সুন্দরবন বি(ের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন এটি অন্যান্য ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের থেকে বেশি বৈচিত্রপুর্ণ। এরা জলা জঙ্গলে যে ৭০০টিরও বেশি প্রজাতির গাছ জন্মায় তার মতো ২৪টি ম্যানগ্রোভ অরণ্য। কয়েকটি ম্যানগ্রোভ গাছের উদাহরণ সুন্দরী, গরাণ, গেঁওয়া, কেওড়া ইত্যাদি। এইসব গাছের সাধারণত জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম, (াসমূল থাকে। এখনও অনেক প্রান্তিক মানুষই সুন্দরবন ও তার সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করে। এদের একটি বড়ো অংশের জীবিকা উপার্জনের একমাত্র উপায় মাছ শিকার। এর পাশাপাশি কিছু সম্প্রদায়ের মানুষ প্রতিবছর একটা নির্দিষ্ট সময় সুন্দরবনে মৌমাছির মধু আহরণে ব্যস্ত থাকে। এই পেশাকে দেশের অন্যতম বিপজ্জনক পেশা বলে অভিহিত করা হয়। কারণ এই পেশাতে প্রতিটি পদ(পে থাকে বাঘের খাদ্য পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। সুন্দরবনের মৌ শিকারিরা মধুসংগ্রহের সময় মাথার পিছনে একটি মুখোশ বেধে থাকে।

উদ্বেগের বিষয় হল বিভিন্ন কারণেই সুন্দরবনের আয়তন ত্র(মশ হ্রাস পাচ্ছে। এই হ্রাস পাওয়ার পিছনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানব আগ্রাসনের পাশাপাশি ঘুর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগ এরাও হাত রয়েছে। বিশেষ করে ভৌগলিক কারণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকায় প্রায় প্রতিবছরই প্রায় একাধিক ঘুর্ণিঝড় আঘাত হানে। আর কয়েক বছর পরপরই মহাশক্তি(শালী ঘুর্ণিঝড় এই এলাকায় তান্ডব চালিয়ে যায়। জাতিসংঘের প্রতিবেদন আনুমানিত ২০০৭ সালে এক ঘুর্ণিঝড় আঘাতে সুন্দরবনের ৪০ ভাগ উধাও হয়ে যায়। সে (তির মাত্রা পুরোপুরি বুঝে ওঠার আগেই দুই বছরের মাথায় ফের আঘাত হানে আয়লা

নামক ঘূর্ণিঝড়। এই ঝড়েও সুন্দরবনের বিদ্যমান জীব বৈচিত্র্য ব্যাপক (য় (তি হয়। প্রাকৃতিক কারণের মতো সুন্দরবন ধ্বংসে মানব সৃষ্ট কারণে ভূমিকা অনেক। এর মধ্যে প্রথমেই রইলো বি(্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আধুনিক ভারতে ভূগোলের জনক হিসাবে শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অবদান

— অভিজিত দাস, 6th Sem. Geo (H)

শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩-২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯) ছিলেন ভারতের একজন ভূগোলবিদ এবং ক্যালকাটা জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা (যা বর্তমানে জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া নামে পরিচিত)। তাঁকে ভারতীয় ভূগোলের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১) তিনি ১৯৬৪-৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। ২) তিনি ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মেঘালয়ের নামকরণ করেছিলেন। ৩) ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করে।

(৪) অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রথম শি(াগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি পড়াশোনায় তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। পরবর্তীতে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর স্নাতকোত্তরের জন্য বেনারস হিন্দু বি(্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ভূতত্ত্বে এম.এস.সি. ডিগ্রি অর্জন করার পর পরবর্তী উচ্চ শি(ার জন্য ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে যান। প্যারিসের সোরবোর্ন বি(্ববিদ্যালয়ে (ইউনিভার্সিটি দ্য প্যারিস) বিখ্যাত ভূগোলবিদ ইমানুয়েল ডি. মর্তোনে এবং পল ভিদাল দে লা ব্লাচ এর অধীনে অসমের দুটি জেলা-গারো, খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের উপত্যকার ভূবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করে প্যারিসের বি(্ববিদ্যলয় থেকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ডি.লিট ডিগ্রি লাভ করেন। (৫) তিনি তার গবেষণাগ্রন্থ - লে প-াটু দে মেঘালায়া (Le Plateau de Maghalaya) - এ মেঘপুঞ্জের পাহাড়ি এলাকাটি নাম দিয়েছিলেন - মেঘালয়। এটি মোনোগ্রাফ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হওয়ার ৩৪ বৎসর পর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্ম হয় স্বশাসিত মেঘালয়ের এবং পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পায় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে। ভারত সরকার এই রাজ্যের নামকরণে শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া নামটি গ্রহণ করেছিল।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ডক্টর চট্টোপাধ্যয় রেঙ্গুন বি(্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ব ও ভূগোল বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত(হন এবং ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি উচ্চ শি(ার জন্য ইউরোপ গমন করেন। পরবর্তীতে ভারতে ফিরে আসার পর তিনি কলকাতা বি(্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং শি(ক প্রশি(ণ বিভাগে ভূগোল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত(করেন। ১৯৩৯ এবং ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে যথাত্র(মে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডিগ্রিকোর্সে কলকাতা বি(্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিভাগের সূচনা করেন। কলকাতা বি(্ববিদ্যালয়ে তিনি ভূগোল বিভাগের প্রধান ও অধ্যাপক নিযুক্ত(হন। তিনি আজীবন এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত(ছিলেন এবং ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণের পরেও সাম্মানিক অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি সমগ্র ভারতের ভৌগোলিক চরিত্র নিয়ে গবেষণা ও উন্নতির জন্য একটি ভৌগোলিক সমাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এর জন্য কলকাতাকে উপযুক্ত(স্থান হিসেবে মনে করেন। ফলস্বরূপ, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই তিনি কলকাতায় কলকাতা ভৌগোলিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এটি জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া নামে পরিচিত।

জাতীয় শি(ানীতি - ২০২০

— ডঃ কল্যান কুমার মণ্ডল

ভারতের প্রথম জাতীয় শি(ানীতির শু(সেই ১৯৬৮ সালে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের আমলে। দ্বিতীয় জাতীয় শি(ানীতি চালু করেন রাজীব গান্ধী সরকার ১৯৮৬ সালে। তৃতীয় ও সর্বশেষ জাতীয় শি(ানীতির প্রবর্তক নরেন্দ্র মোদী সরকার। সালটা ২০২০। এর মূল রূপকার হলেন মহাকাশ বিজ্ঞানী কে. কস্তুরীরঙ্গন।

এই শি(ানীতিতে বর্তমান শি(া ব্যবস্থার খোল নোলচে অর্থাৎ আমুল পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। এই পরিবর্তনের একটি গু(ত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, শি(ায় বিভিন্ন স্তরের কাঠামোগত পরিবর্তন। বর্তমানে সারা দেশে স্কুল শি(া চারটি ভাগে বিভক্ত(, যথা প্রাথমিক, উচচ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক। প্রধানত শহরাঞ্চলে প্রাথমিকের আগে কিন্ডার গার্ডেন, পে- স্কুল ইত্যাদি চালু থাকলেও তা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু জাতীয় শি(ানীতিতে প্রাথমিকের আগে তিন বছর আব্যশিক করা হয়েছে। এর সঙ্গে ক্লাস ওয়ান ও ক্লাস টুকে যুক্ত(করে মোট পাঁচ বছরের শি(াকে বলা হয়েছে 'ফান্ডামেন্টাল স্টেজ'। ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম শ্রেণিকে নিয়ে তিন বছরের 'প্রিপারেটরী স্টেজ', ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম শ্রেণিকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে 'মিডিল স্টেজ'। সেকেন্ডারী স্টেজ বলা হয়েছে ৯ম থেকে ১২ম শ্রেণিকে নিয়ে, যার বিস্তার চার বছর। স্কুল শি(ার এই চারটি স্তরকে ৫+৩+৩+৪ ব্যবস্থা বলা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় কোন মাধ্যমিক পরী(া থাকছে না। আবার কলেজস্তর তিন বছরের পরিবর্তে হচ্ছে চার বছরের।

স্কুল শি(ায় ব্যাপক কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা বলা হলেও শি(ক, শি(াকেন্দ্র প্রভৃতির ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট অভাব রয়েছে বলে মনে হয়। কারণ শি(ার একটি স্তম্ভ হল শি(ক। আবার শি(ার জন্য প্রয়োজন উৎকৃষ্ট মানের পরিকাঠামোযুক্ত(স্কুল। এই শি(ানীতিতে বলা হয়েছে শিশু শি(ার কেন্দ্র হল অঙ্গনওয়াড়ি। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা হলেন শি(ক। এঁরা অনলাইনে প্রশি(ন পাবেন ৬ থেকে ১ বছর পর্যন্ত। শি(াকেন্দ্রগুলি হবে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থযুক্ত(, শিশু বান্ধব সুগঠিত বাড়ি এবং তাতে থাকবে উন্নত মানের শিখন পরিবেশ।

অঙ্গনওয়াড়ি হল সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (ICDS) এর অধিনে কিছু কেন্দ্র যেখানে শিশুদের পুষ্টি ও পড়াশোনার ব্যবস্থা থাকে। সারাদেশে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির দৈন্যদশা আমরা সবাই জানি। জরাজীর্ণ ঘর, বসার ব্যবস্থার অভাব তার নিত্যসঙ্গী। অনেক সময় ক্লাব ঘরে ও চলে অঙ্গনওয়াড়ির কাজকর্ম। কর্মীর সংখ্যা ও অপ্রতুল।

জাতীয় শি(ানীতি বর্ণিত উচচগুনসম্পন্ন শিশু শি(া হবে পরিকাঠামোহীন এই সব পর্ণকুটিরে? আবার শিশুদের যে ভিজুয়াল আর্ট, নাটক, গান, পুতুলনাচ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে, তা কি শি(কদের অনলাইন প্রশি(নের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে শেখা সম্ভব ? যদি তাঁরা সঠিকভাবে প্রশি(িত না হন তবে তার প্রভাব কি ছাত্র সমাজের উপর পড়বে না ?

এবারে আমি বৃত্তিমূলক শি(ায়। ৪.২৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে শি(ার্থী নানারকম বৃত্তিমূলক শি(া যেমন ইলেকট্রিকের কাজ, ধাতু শিল্প, কাঠের কাজ ইত্যাদি শিখবে। শেখাবে স্থানীয় কারিগর যাদের 'মাস্টার ইনস্ট্রাকটর' বলা হয়েছে। পুরো শি(াবর্ষে ১০ দিন তারা ঐ সমস্ত কারিগরদের

কাছে পাঠ নেবে। আবার উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ শি(ার্থীকে বৃত্তিমূলক শি(ার সঙ্গে যুক্ত(করতে হবে। এখন প্র(হল, এই বিরাট সংখ্যক বৃত্তিমূলক শি(াপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের কাজ কোথায়? বর্তমানে মেশিনে তৈরী জিনিষ বাজার ছেয়ে গেছে। কারণ উৎপাদন ব্যয় কম। তার উপর সস্তায় সহজলভ্য চীনা সামগ্রী। বর্তমানে বাজার সমস্যার জন্য হস্তশিল্পীরা আজ পেশা সংকটে। এই রকম পরিস্থিতিতে ল(ল(ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের কাজের ভবিষ্যত কি উজ্জ্বল ?

স্কুল ছুট সমস্যা আমাদের দেশে একটা বড় সমস্যা। সরকার স্বীকার করেছে যে, ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেনির মধ্যে মোট তালিকাভুক্ত(ছাত্রছাত্রীদের অনুপাত ৯০.৭ শতাংশ। নবম ও দশম শ্রেণিতে তা কমে হয় ৭৯.৩ শতাংশে। একাদশ ও দ্বাদশে তা আরো কমে হয় ৫৬.৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রাথমিকে একশ জন ভর্ত্তি হলে দ্বাদশ শ্রেণিতে পৌঁছায় ৫৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। অর্থাৎ ৪৪ শতাংশ স্কুল ছুট বা ড্রপ আউট। কি কারণে এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ড্রপ আউট হচ্ছে এবং তার সমাধান কোন পথে — তার কোন সুনির্দিষ্ট দিশা জাতীয় শি(া নীতিতে পাওয়া যায়নি।

ভাষা শি(ার (ত্রে সংস্কৃতকে অনাবশ্যক অত্যাধিক গু(ত্ব দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীর উপর গু(ত্ব খুবই কম। বলা হয়েছে সংস্কৃত শুধু একটি বিষয় হিসাবে পড়লে হবে না, তাকে বিশেষ গু(ত্ব সহকারে শি(ার মূল স্রোতে আনতে হবে। অন্যান্য বিষয় ও সংস্কৃত ভাষায় পড়তে হবে। এর পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে Sanskrit Knowledge System সংস্কৃত একটি প্রাচীন ভাষা। ২০১১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন মোট ২৪৮২১ জন। অর্থাৎ যৎ সামান্য। চর্চা খুবই সীমাবদ্ধ। এছাড়া সংস্কৃত ভাষায় উচ্চ শি(ার বিভিন্ন বিষয়ের বই অপ্রতুল বললে বেশি বলা হয়। এমতাবস্থায় ইংরেজীর গু(ত্ব কমিয়ে সংস্কৃত ভাষার বিপুল যজ্ঞের আয়োজন কতটা যুক্তি(সংগত ?

এবারে আসা যাক্ কলেজ শি(ায়। এই নতুন শি(ানীতি অনুযায়ী উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ সবাইকে কেন্দ্রিয় সরকার দ্বারা গঠিত National Testing Agency দ্বারা গৃহীত সর্বভারতীয় পরী(ায় বসতে হবে। উত্তীর্নরাই উচ্চশি(ার সুযোগ পাবে। তবে কি উচ্চমাধ্যমিক পাশ কিন্তু NTA পরী(ায় ফেল ছাত্রছাত্রীরা কোন দিন স্নাতক হতে পারবে না ? আবার দ্বাদশ শ্রেণি পাশ সকল ছাত্রছাত্রীদের কলেজে ভর্ত্তির কোন নৈতিক দায়িত্ব থাকবে না সরকারের। বর্তমানে স্নাতক স্তর তিন বছরের, যাকে Three Years degree course বলে। এক বছর বাড়িয়ে একে চার বছর করা হয়েছে। শি(াদানের মাধ্যম হিসাবে অনলাইন মোডকে অত্যাধিক গু(ত্ব দিয়ে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে অফলাইন মোড। বলা হয়েছে মোট ক্লাসের 70% পর্যন্ত ক্লাস অনলাইন মোডে হতে পারে। গুগল মিট, জুম প্রভৃতি অ্যাপের দ্বারা হবে ক্লাস। ক্লাস লেকচার আপলোড করতে হবে ইউ টিউবে। শি(ার্থী নিজেদের সুবিধামত তা দেখে নেবেন। এর অপরিহার্য ফল হিসাবে বলা যায় যে, শি(কের সঙ্গে শি(ার্থীর সরাসরি পারস্পরিক যোগাযোগ কমে যাবে। শি(ার্থী বিষয়বস্তু কতটা বুঝলো তা জানার উপায় থাকবে না শি(কের। ছাত্র-শি(ক ক্লাস(মে মুখোমুখি বসে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে যে শি(ালাভ করে তা কি প্রযুক্তি(নির্ভর যান্ত্রিক ব্যবস্থায় পূর্ণভাবে হতে পারে?

কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন নেতিবাচক দিকগুলি দেখে মনে প্র(জাগে যে, শি(া সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও ঝোঁক ঠিক কোন দিকে ? একদিকে সরকার অন্যান্য সেক্টরের মতো শি(াকে বিশেষত উচ্চশি(াকে বেসরকারীকরণ করতে চাইছে, তেমনি অন্যদিকে শি(া(ত্রে আমদানি করছে বিভিন্ন অপবিজ্ঞানের। যেমন ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত(বি(বিদ্যালয়ে চালু হয়েছে জ্যোতিষের মতো অবৈজ্ঞানিক বিষয়। শি(াখাতে GDP এর 6% ব্যয়ের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা অনেক কম। ২০১৪-

১৫ অর্থবর্ষে তা ছিল 4.6%। পরের বছরগুলিতে তা ত্র(মান্বয়ে কমছে। বর্তমানে কেন্দ্রিয় সরকারের কর্তা ব্যক্তি(দের শি(া সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তব্য চিন্তাধারার দৈনত্যাকে প্রকাশ করে। যেমন সাত হাজার বছর আগে ভারতে বিমান ছিল, গোমূত্রে ক্যানসার নিরাময়, মহাভারতের যুগে ইন্টারনেট ও আরো কত কি! এগুলি কি এতিহ্যের নামে শি(ায় হিন্দুত্ববাদী চিন্তাধারার ফসল ?

উত্তর সেন্টিনেলী জনগোষ্ঠী

— সুমন কর্মকার, 6th Sem. Geo (H)

ভূমিকা ঃ দ্বীপটি হল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে একটি দ্বীপ, বঙ্গোপসাগরের মধ্যে একটি দ্বীপপুঞ্জ। সেখানে দ(িণ সেন্টিনেল দ্বীপও রয়েছে। এটি সেন্টিনেলীদের বাসস্থান, এমন একটি উপজাতি যারা বাইরের বিশ্বের সাথে কোনও যোগাযোগকে মেনে নেয়নি। অনেক সময় হিংস্রতার সাথে প্রত্যাখান করেছে। তারা আধুনিক সভ্যতার শেষ যোগাযোগ বিহীন মানুষদের মধ্যে একটি উপজাতি, আধুনিক সভ্যতা কার্যত যাদের ছুঁতে পারেনি।

প্রশাসনিকভাবে, দ্বীপটি ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দ(িণ আন্দামান জেলার অন্তর্গত। বাস্তব, ভারত সরকার দ্বীপটিকে একান্তে থাকার ইচ্ছেকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং দূর থেকে পর্যবে(ণের মধ্যেই নিজেদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ করে রেখেছে (মানুষ হত্যা করার জন্য তাদের বি(দ্ধে কোন মামলা সরকার করে না। দ্বীপটি ভারতীয় সুর(ার অধীনে কার্যকরভাবে একটি সার্বভৌম অঞ্চল।

১৯৫৬ সালের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী উপজাতি সুর(া আইনের বলে সুর(িত। এই দ্বীপে ভ্রমণ এবং (৯.২৬ কিমি) থেকে কাছাকাছি যে-কোন যোগাযোগের চেষ্টা নিষিদ্ধ।

উত্তর সেন্টিনেল দ্বীপটি দ(িণ আন্দামান দ্বীপের ওয়ানডুর শহরের ৩৬ কিলোমিটার পশ্চিমে, পোর্ট ব্লেয়ারের থেকে ৫০ কিমি পশ্চিমে এবং দ(িণ সেন্টিনেল দ্বীপের ৫৯.৬ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। এই দ্বীপটি ৫৯.৬৭ বর্গ কিমি বা ২৩.০৪ বর্গ মাইল (ে ত্র নিয়ে বিস্তৃত রয়েছে এবং এর বহিঃসীমা মোটামুটি বর্গাকার।

এখানে কোন প্রাকৃতিক বন্দর নেই। উপকূল ছাড়া পুরো দ্বীপটি বনভূমি। দ্বীপটিকে ঘিরে একটি স(, সাদা-বালিয়াড়ী রয়েছে, তার পিছনে জমি ২০ মি পর্যন্ত উঁচু হয়ে গেছে এবং তারপর ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় অংশ অবধি ৪৬ মি থেকে ১২২ মি পর্যন্ত উঁচু জমি আছে। দ্বীপের চারপাশে প্রবাল প্রাচীর সমুদ্র সৈকত থেকে ১.৫ কিলোমিটার (০.৫-০.৮ নটিক্যাল মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রবাল প্রাচীরের ধারে একটি বনভূমিময় (ুদ্র দ্বীপ, কনস্ট্যান্স দ্বীপ, বা ''কনস্ট্যান্স দ্বীপাণু'' ও বলা হয়। দ(িণ-পূর্ব সমুদ্র তট থেকে ৬০০ মিটার দূরে অবস্থিত।

২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরের ভূমিকম্পে দ্বীপের নিচে টেকটোনিক প্লে-টটিকে কাত করে দিয়েছিল, যার ফলে দ্বীপটি ১ থেকে ২ মিটার ওপরে উঠে যায়। এর ফলে আশেপাশের প্রবাল প্রাচীরগুলির অধিকাংশ উন্মোচিত হয়ে পড়েছিল এবং স্থায়ীভাবে শুষ্ক জমি বা অগভীর উপহ্রদে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।এর

জন্য দ্বীপের সমস্ত সীমানা পশ্চিম এবং দ(ণ দিকে প্রায় ১ কিলোমিটার প্রসারিত হয়ে যায় এবং কনস্ট্যান্স দ্বীপটি মূল দ্বীপের সাথে সংযুক্ত(হয়ে যায়।

সেন্টিনেলী জনগোষ্ঠী ঃ- সেন্টিনেলী জনগোষ্ঠী হল আন্দামানি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত(একটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী। বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বসবাসরত একটি বিচ্ছিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত(এই জাতি দ(ণ এশিয়া জনগোষ্ঠীগুলোর একটি। গ্রেট আন্দামান উত্তর সেন্টিনেলী দ্বীপপুঞ্জে এই জনগোষ্ঠীর বাস। বহিরাগতদের ওপর আত্র(মণাত্মক মনোভাবের জন্য তারা বিশেষভাবে পরিচিত। সেন্টিনেলী জাতি মূলত একটি শিকার নির্ভর জাতি। তারা তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ শিকার, মাছ ধরা এবং বন্য লতাপাতার মাধ্যমে সংগ্রহ করে। এখন পর্যন্ত তাদের মাঝে কৃষিকাজ করা বা আগুন ব্যবহারে প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

জাতিসত্বা ও দৈহিক গঠন ঃ- জাতিসত্বার দিক থেকে আন্দামানি নিগ্রোয়েড নৃ-তাত্তিক গোষ্ঠীভুক্ত(। কৃষ(াঙ্গ হাল্কা রক্তি(ম আভা যুক্ত(গায়ের রং, ছোটো কোঁকাড়ানো চুল, বড়ো মুখমন্ডল ও উচু চোয়াল, হাল্কা চেহারা সেন্টিনেলীদের দৈহিক গঠন। এরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে চায় তাই তারা কোনোরকম মানুষকে তাদের দ্বীপে প্রবেশ করতে দেয়নি তাই তারা তাদের সংস্কৃতি এখনও উত্তরাধিকার ভাবে ধরে রেখেছে।

জীবনযাপন ঃ- সেন্টিনেলীরা জীবন ধারণের জন্য প্রাকৃতিক বনজ উপাদান এবং সমুদ্র সম্পদের উপর নির্ভর করে। এরা কৃষিকাজ বা অন্যভাবে ফসল বা ফল উৎপাদন করতে পারে না। এরা পুরোপুরি প্রকৃতির উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে। এরা ফল মূল ও বনজ বিভিন্ন পশুকে শিকার করে ও সমুদ্র থেকে মাছ ধরে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এরা আগুনের ব্যবহার এখনও পর্যন্ত জানেনি। এরা প্রস্তর যুগের মত জীবন ধারণ করে। এদের ঘর বাড়ি বিভিন্ন গাছের উপাদান দিয়ে তৈরি। শিকারের জন্য এরা পুরোপুরি তির ধনুক, পাথরের তৈরি ফলা ও বর্শা ব্যবহার করে শিকারের পর এরা খুবই আনন্দ করে। পোশাক বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি যেমন মহিলাদের জন্য হাল্কা স(বস্ত্র গাছের তন্তু গলায় কোমরে পরিধান করে ও পু(ষরা শুধু কোমড়ে পরিধান করে। এরা বেশিরভাগ সময় উলঙ্গ অবস্থায় জঙ্গলে থাকে। পরিবেশকে এরা সঠিক ভাবে ব্যবহার করে। এরা নিজেদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে যাহাতে জনসংখ্যা কম বা বেশি না হয়। সভ্য সমাজ থেকে নিজেদেরকে আলাদা রাখতে চায়।

বহিরজগতের সঙ্গে সম্পর্ক ঃ- সেন্টিনেলী জনগোষ্ঠী বাইরের জগৎ সম্বন্ধে কোন কিছু জানে না এরাই একমাত্র জাতি যারা কি না বর্হিজগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায় না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে যেমন - ১৯৬৭ সাল থেকে পোর্টব্লেয়ারে অবস্থিত ভারতীয় কর্তৃপ(সেন্টিনেলীদের সাথে যোগাযোগ করার বেশকিছু পদ(প নিয়ে আসছে। নৃতাত্ত্বিক ও ভারতের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্টের মহাপরিচালক ত্রিলক নাথ পণ্ডিতের নেতৃত্বে সেন্টিনেলদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বেশকিছু অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসব অভিযানে তাদেরকে উপহার হিসেবে সমুদ্র সৈকতে খাবার ছড়িয়ে (যেমন ঃ নারকেল, ফুটবল, পুতুল ও শুকর) বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। এসব প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেন্টিনেলদের মধ্যে তৈরি বহিরাগতদের সম্পর্কে সৃষ্ট হিংস্র মনোভাব দূর করার চেষ্টা করা হয়।

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি বাঙালি নৃতত্ত্ববিদ মধুমালা চট্টোপাধ্যায় সহ ১৩ জনের একটি যোগাযোগকারী দল পৃথিবীর অন্যতম এই বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী সেন্টিনেলীদের সঙ্গে প্রথম এবং একমাত্র

বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ সাধনে স(ম হন। পরর্বতীতে, বেশ কিছু সময়ের জন্য ধারণা করা হয়েছিলো। অভিযানগুলো ফলপ্রসূ হচ্ছে, কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে বহিরাগতদের সাথে দ(ণ ও মধ্য আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বসবাসরত জারোয়া জাতিগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত একইরকম অভিযানে সৃষ্ট বেশ কিছু ধারাবাহিক আত্র(মণে কিছু মানুষ প্রাণ হারায়। এছাড়াও নতুন রোগের বিস্তারের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় অভিযানগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর ২০০৬ সালে সেন্টিনেল তীরন্দাজরা তাদের দ্বীপে অনুপ্রবেশকারী দুইজন জেলেকে তীর মেরে হত্যা করে। পরবর্তীতে সেন্টিনেল তীরন্দাজরা মরাদেহ উদ্ধারে আসা হেলিকপ্টারটিকেও তীর মেরে হটিয়ে দেয়। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত ঐ জেলেদের মরাদেহ উদ্ধার করা যায়নি। যদিও উদ্ধার অভিযানে আসা হেলিকপ্টার থেকে তাদের মরাদেহ দেখা গিয়েছিলো। কারণ উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারের পাখার ঘূর্ণনে সৃষ্ঠ প্রবল বাতাসের তোড়ে সেন্টিনেলদের অল্প গভীর কবরের মাটি সরে গিয়ে ঐ দুজন জেলের মৃতদেহ দেখা যায়।

২০১৮ সালে আমেরিকান ধর্মপ্রচারক, জন অ্যালেন চাউ তার খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য নভেম্বর মাসে তিনি ওই দ্বীপে যাত্রা করেন তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন কিছু শুকনো মাছ, একটা ফুটবল একটা ছোটে নৌকা, কিছু কাঁচি, কোনো অনুমতি ছাড়াই অনৈতিক ভাবে ওই দ্বীপে প্রবেশ করে। প্রথমবার তিনি প্রান বাঁচানোর ভয়ে চলে আসেন। তিনি আবার উত্তরদিক থেকে প্রবেশ করার চেষ্টা করে ও সেন্টিনেলীদের তিরের আঘাতে মারা যান। মারা যাওয়ার আগে তিনি তার ডাইরীতে লিখে যান — ''আমি নিহত হলে দয়া করে তাদের বা ঈ(রের উপর রাগ করবেন না ... আমার শরীর পুন(দ্ধার করবেন না।'' Please do not angry at them or at God if I get killed ... Don't retrieve my body. অন্য একটি সফরে জন অ্যালেন চাউ রেকডল করেছেন যে দ্বীপবাসীরা তাকে বিনোদন, বিভ্রান্তি এবং শত্রুতার মিশ্রণে প্রতিত্রি(য়া জানিয়েছিল। তিনি তাদের কাছে পূজার গান গাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাদের সথে জোসা (দ(ণ আফ্রিকায় কথিত একটি ভাষা) ভাষায় কথা বলেছিলেন, যার পরে তারা প্রায়শই চুপ হয়ে যায়। তাদের সাথে যোগাযোগের অন্যান্য প্রচেষ্টা হাসিতে ফেটে পড়ে। চাউ বলেছিলেন যে তারা ''অনেক উচ্চ ধ্বনি'' এবং অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিল। অবশেষে, চাউ-এর শেষ চিঠি অনুসারে, যখন তিনি মাছ এবং উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তখন একটি ছেলে একটি ধাতব-মাথাযুক্ত(তীর ছুড়েছিল যা তার বুকের সামনে রাখা বাইবেলটিকে বিদ্ধ করেছিল, তারপরে সে আবার পিছু হটেছিল।

তার চূড়ান্ত সফলে, ১৭ নভেম্বর চাউ জেলেদের তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। জেলেরা পরে দেখল দ্বীপবাসীরা চাউ-এর মৃতদেহ টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং পরের দিন তারা সমুদ্রের তীরে তার মৃতদেহ দেখতে পায়।

মাসাই

— রিয়া মন্ডল , 2nd Sem. Geo (H)

ভূমিকা ঃ পূর্ব আফ্রিকার প্রায় ১২৫ টি আদি জনগোষ্টির মধ্যে পশুপালক 'মাসাই' রা হল সবচেয়ে বৈচিত্রময় পরাত্র(মশালী, যোদ্ধা জনজাতি, মাসাইরা হল নিগ্রো জনজাতি সংমিশ্রন। গবাদি পশুপালন মাসাই উপজাতির বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন বলে, কোনো ও কোনোক্স ভৌগোলিক, এদের এই রীতিকে "the breath of life" বলে অ্যাখ্যায়িত করেছেন।

নামকরন ঃ- নিলোটিক সাহারার একটি গু(ত্বপূর্ণ ভাষা হল মা। ভৌগোলিকদের মতে, এই 'মা' ভাষা থেকেই মাসাই নামের উদ্ভব ঘটেছে। মাসাই শব্দের মূল অর্থ হল "Gods Work" বা ঈ(রের কর্ম। প্রসঙ্গত, আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার কিছু মানুষ মাসাইদের "Nobel Savag" বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পরিচিতি ঃ-

১। বাসস্থান - পূর্ব আফ্রিকার দ(িণ কেনিয়ার মালভূমি, উত্তর তাঞ্জানিয়া উত্তর টাঙ্গানাইকা এবং পূর্ব উগান্ডায় মাসাইরা বসবাস করে।

২। নৃতাত্বিক শ্রেণি - মাসাইরা আদিম আফ্রিকার সামবু(নৃতাত্ত্বিক শ্রেণির অন্তর্গত।

৩। সম্প্রদায় কেনিয়াতে মাসাইরা দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত(, যথা - i) Black Ox শ্রেণির মাসাই এবং ii) Red Bullock শ্রেণির মাসাই।

৪। দৈহিক গঠন ঃ- i) এরা অত্যন্ত - লম্বা ও ঋজু, ii) হাড় সুগঠিত ও দীর্ঘ, iii) হাত ও পায়ের পাতা সংকীর্ণ, কিন্তু দীর্ঘ আঙুল বিশিষ্ট, iv) মুখমন্ডল স(, উঁচু ও চাপা মাথা, v) দীর্ঘ অল্প কোঁকড়ানো কেশকায়।

৫। অ(াংশ ঃ- পূর্ব আফ্রিকার শুষ্ক ও শুষ্কপ্রায় জলবায়ুতে ১° উত্তর অ(াংশ থেকে ৬° দ(িণ অ(াংশের গ্রেট রিফট উপত্যকা বরাবর প্রায় ১৬০০০০ বর্গ কিমি স্থান জুড়ে অবস্থান করেছে।

মাসাই অধিবাসী ঃ- মাসাই জনসংখ্যা ১০ ল(বলা হলেও সঠিক জনসংখ্যা বলা মুশকিল। তবে বর্তমানে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিসেবার সুযোগ গ্রহন করায় উচ্চ মরণশীলতা ও জন্মকালীন শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। মাসাইগন যোদ্ধা জনজাতি হিসেবে চিহ্নি(ত। আফ্রিকার জনজাতি সমূহের মধ্যে মাসাইদের মতো এত শক্তি(শালী ও বিচ(ন জনজাতি বিরল বলে অভিমত ব্যক্ত(করা হয়।

মাসাই পু(ষ ঃ- এরা দীর্ঘদেহি, গড় উচ্চতা ৬ ফুটের বেশি। বয়স অনুসারে মাসাই পু(ষদের ৫৩ ভাগে বিভক্ত(করা হয় - বালক, যোদ্ধা ও বয়স্ক পু(ষ। ১৪-৩০ বছর বয়স্ক পু(ষদের বলা হয় মোরান।

মাসই নারী ঃ এরা দীর্ঘকায়া, তারা গৃহকর্মে নিযুক্ত(হাতের কাজ যেমন অলংকারাদি প্রস্তুত। সূচীশিল্প ইত্যাদি শেখেন। নারীদের শি(ার সুযোগ কম। মাসাই সমাজে নারীশি(ার উৎসাহের অভাব দেখা যায়। বাল্যবিবাহের আধিক্য রয়েছে। মাসাই সমাজে বিধবা বিবাহের অধিকার থেকে নারীরা অধিকাংশ (ে ত্রে বঞ্চিত হন।

ভৌগোলিক অবস্থা ঃ- যদিও মাসাইদের এলাকাটি নির(ীয় জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যে পড়ে তবুও এখানকার উষ(তা ১৪° সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকে। দিনেরবেলা গরম এবং রাতের বেলা ঠান্ডা। গড় বাষিক বৃষ্টিপাত ১০০ সেমির বেশি হয় না। বৃষ্টিপাত শৈলোৎ(েপ প্রকৃতির এবং বছরের বেশিরভাগ বৃষ্টি এপ্রিল -মে মাসে সংঘটিত হয়। এধরণের জলবায়ু অঞ্চলে ঘাস জন্মায়, সে ঘাসগুলোর উচ্চতা ১ ফুট বা তার কাছাকাছি হয়। এখানে কাঁটা জাতীয় গাছ ও ঝোপঝাড় জন্মায়।

পরিব্রাজন ঃ- প্রকৃতপ(মাসাইরা একটি পরিব্রাজিত জনগোষ্ঠি। ১৫ শতকের কাছাকাছি সময়ে মাসাইগন উত্তর পূর্ব কেনিয়ার নিম্ন নীল বদ্বীপ অঞ্চল থেকে পরিব্রাজন শু(করে। পরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যে গবাদি পশুপালনের মধ্য দিয়ে মাসাইরা তাঞ্জানিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পরে উনিশ শতকের মাঝামাঝি মাসাইরা পূর্ব আফ্রিকার গ্রস্ত উপত্যকা বরাবর উত্তরে মাউন্ট মার্সাবিট থেকে দ(ণে ডোডোমা অঞ্চল পর্যন্ত পরিব্রাজনের মাধ্যমে নিজেদের বসতি বিস্তার ঘটায়।

জীবিকা ঃ- ১৯ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ শাসকেরা মাসাইদের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ করে ফলে। মাসাই ভূমির প্রায় ২/৫ ভাগ সংকুচিত হয়। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ অধীনতা মুক্ত(হলেও কেনিয়া ও তানজানিয়া সরকার বনভূমি ও তৃণাঞ্চল সংর(নের জন্য মাসাইদের পশুচারণের জমি সংকুচিত করেছে। মাসাইরা প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলে তৃনাঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী পশুচারনের অধিকার আদায়ে সরব হয়েছেন। তৃনাঞ্চলে অবাধ পশুচারন এবং বনাঞ্চলের বহুস্থানে পশুচারন নিষিদ্ধ হওয়ায় গবাদি পশুসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ফলে মাসাই সমাজে গবাদি পশু নির্ভরতা আগের চেয়ে অনেক কমেছে।

ঐতিহ্যগতভাবে 'মাসাইগন যাযাবর পশুপালক' পালিত পশুর মধ্যে রয়েছে গ(, ভেড়া, ছাগল, গাধা প্রভৃতি। গবাদি পশুর পাল নিয়ে তৃণ ও জলের সন্ধানে এক স্থান থেকে অপর স্থানে গমন করেন এবং অস্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন। আঞ্চলিক পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান থাকায় তারা জানেন কোথায় কোন সময় তৃণগুল্মাদি পশুচারনের উপযুক্ত(হয়ে উঠবে এবং সেই অনুযায়ী তাদের প্রব্রজনের ছকটি তৈরি থাকে।

শিকার ও সংগ্রহ ঃ- অনেকসময় মাসাই অধিবাসীরা বিনোদন কিংবা খেলার ছলে স্থানীয় কিছু ছোটো ছোটে জীবজন্তু ও পাখি শিকার করে থাকে। মাসাইদের ব্যবহৃত প্রধান অস্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম হল - তির, পাতলা স(তরবারি, দীর্ঘ ফলাযুক্ত(বর্শা প্রভৃতি।

খাদ্য তালিকা ঃ- মাসাইদের প্রধান খাদ্য তালিকায় ঐতিহ্যগত দিক থেকে মোট ৬টি মৌলিক খাবারের প্রাধান্য রয়েছে। সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল -

১) দুধ ঃ- মাসাইরা যে সমস্ত গবাদি পশুগুলিকে প্রতিপালন করে তাদের থেকেই দুধ সংগ্রহ করে থাকে। তবে মাসাইরা টাটকা দুধের তুলনায় টক হয়ে যাওয়া দুধই বেশি পান করতে পছন্দ করে। তবে অসুস্থ মাসাইরা ফোটানো দুধ খেতে দেওয়া হয়। অনেক সময় এরা দুধ থেকে দই কিংবা মাখন তৈরি করেও খায়।

২) মাংস ঃ- মাসাইরা প্রায় সবধরণেরই পশুজাত মাংস খেয়ে থাকে। তবে এদের খাদ্য তালিকায় ভেড়া ও মহিষ মাংস রূপে সবচেয়ে জনপ্রিয়। প্রসঙ্গগত মাসাইরা দুধ ও মাংস কখনই একসঙ্গে ভ(ন করে না। এমনকি এদুটিকে একসাথেও রাখে না। মাসাইরা মনে করে দুধ ও মাংস একসঙ্গে রাখলে গবাদি পশুরা গু(তর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে তাই এরা দুধ ও মাংস কখনই একসঙ্গে খায় না।

৩) চর্বি ঃ- মাসাইরা যখন পশুবলি করে তখন মৃত পশুর ছাল থেকে কিংবা মাংস থেকে চর্বিগুলোকে আলাদা করে রাখে। এবং পরে সেগুলিকে খেয়ে থাকে।

৪) রক্ত(ঃ- মাসাই সমাজের পুরোনো নীতি অনুসারে অনেকেই পশুজাত রক্ত(পান করে থাকে। মাসাইরা মনে করে পশুর রক্ত(শরীরে রোগ প্রতিরোধের (মতা যেমন বৃদ্ধি করে তেমনই শরীরকে বলশালি করে তোলে। আবার মাসাই সমাজে কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা নারীরা সন্তান জন্মোদানের পর তাকে সুস্থ করে তুলতে তাকে রক্ত(পান করতে দেওয়া হয়। মাসাইরা প্রতি সপ্তাহে গ(বা মহিষের গলায় তীর দিয়ে ছেদ করে সেই রক্ত(দুধের সাথে পান করতে খুবই পছন্দ করে।

৫) গাছের ছাল ঃ- মাসাইরা বিভিন্ন গাছের ছালকে দুধে ভিজিয়ে রেখে। ভেষজগুন সম্পন্ন ঔষধ রূপে

পান করে থাকে। মাসাইদের কাছে ভেষজগুন সম্পন্ন এই ধরণের খাদ্য Motori নামে পরিচিত।

প্রথাগত কৃষি ঃ- প্রথাগতভাবে কৃষিজীবি না হলেও তৃণভূমি সংকুচিত হওয়ায় বর্তমানে কিছু শস্য যেমন সরগম, ধান, আলু প্রভৃতি চাষ করে নিজেদের খাদ্য উৎপাদনে সচেষ্ট হন। কেনিয়া ও তানজানিয়া সরকার মাসাইদের স্থায়ী কৃষিজীবিতে পরিণত করার চেষ্টা করলেও তেমনভাবে সফলতা আসেনি। তবে মাসাই যুবকরা প্রব্রজনকালে কৃষি নির্ভর জমিটির সংস্পর্শে এসে উক্ত(সম্প্রদায়ের নারীদের সঙ্গে অনেক সময় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উক্ত(উভয় কারণে মাসাইদের মধ্যে প্রথাগত কৃষি কিছুটা প্রচলন হয়েছে।

মাসাইগন আফ্রিকার দাস নিয়োগ থেকে নিজেদের সবসময়ই দূরে রেখেছেন এবং দাস নিয়োগকারীরাও মাসাইদের দাস হিসাবে নিয়োগ সফল হয়নি।

মাসাই জনজাতি অরণ্য ও তৃণভূমির পরিবেশে বন্য জীবজন্তুর সঙ্গে সহাবস্থান করে নিজেদের স্বাধীন জীবনযাত্রাকে টিকিয়ে রাখতে সবসময়ই সচেষ্ট থেকেছেন। যোদ্ধা জনবসতি হিসেবেই তাদের পরিচিতি। নিখুত ল(্যভেদে মাসাই যুবক অব্যর্থ। ৫০-১০০ মিটার দূরেও নিপুনভাবে ছোড়া বর্ষা ল(্যভেদ করে।

পর্যটন ঃ- মাসাইদের বাসভূমি বিভিন্ন বন্যপ্রাণী ও প্রাকৃতিক সংর(ণাগার হিসেবে প্রসিদ্ধ। পর্যটন শিল্পের সঙ্গে তারা অনেকে যুক্ত(হয়ে পড়েছেন। অরণ্যকে পরিবেশে মাসাই সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাকে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরে পর্যটকদের আরো আকৃষ্ট করতে সংশ্লিষ্ট মহলে যথেষ্ট উদ্যোগ দেখা যায়। এ থেকে মাসাই গ্রামবাসীদেরও কিছু উপার্জন হয় এবং তারা তাদের হাতে তৈরি অলংকার ও অন্যান্য আকর্ষনীয় সামগ্রী পর্যটকদের কাছে বিক্রি(করে কিছু উপার্জন করতে পারেন।

আধুনিক পেশা ঃ- বর্তমানে বেশ কিছু মাসাই যুবক আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রমভিত্তিক পেশায় নিযুক্ত(হয়েছেন এবং যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে স্থায়ী জীবনযাত্রা বেছে নিয়েছেন। পর্যটন শিল্পে টুরিস্ট গাইড, পৌর শিল্প এলাকায় নিরাপত্তার(ী হোটেলকর্মী ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত(হচ্ছেন।

মাসাই সমাজ ঃ- পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, বয়স্ক পু(ষেরা সমাজে নেতৃত্ব দেন এবং বিভিন্ন সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। বিবাদের মীমাংসায় মৌখিক আইন প্রয়োগ হয়ে থাকে। জরিমানা হিসেবে গবাদি পশু দিয়ে ও বিবাদ মেটানো হয়।

বস্ত্র সংত্র(ান্ত অভিযোজন ঃ- মাসাইদের পোশাক যথেষ্ট ঐতিহ্যপূর্ণ এবং সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে। বেশিরভাগ মাসাই জনগোষ্ঠী অত্যন্ত রঙিন শুকা নামক এটি পোশাক পরিধান করে, যা বিভিন্ন রঙিন কাপড়ের থানকে প্যাঁচ দিয়ে তৈরী করা হয়। পু(ষ মাসাইদের পোশাকের প্যাঁচ 'কিকই' এবং মহিলা পোশাকের প্যাঁচ 'কাংগা' নামে পরিচিত। মাসাই সমাজের বৈচিত্র্যময় পোশাকের পরিচয় হয় নিম্ন(প —

১) মাসাই সংস্কৃতির একটি বৈচিত্র্যময় প্রতীক হল লাল পোশাক পরিধান। এটি অবশ্য আলাদা একটি অর্থ বহন করে। অধিকাংশ মাসাইরা মনে করেন, লাল রঙ দেখে সিংহরা ভয়ে পালিয়ে যায়।

২) মাসাই সমাজের মহিলারা ছাগলের চামড়ার তৈরী পোশাক এবং পু(ষ যোদ্ধারা সিংহ কিংবা অন্যান্য জন্তুর চামড়ার পোশাক পরিধান করে।

৩) নারী পু(ষ নির্বিশেষে মাসাইরা রঙিন পুঁতির গয়না ব্যবহার করে। বিশেষ করে পু(ষরা তাদের কোমর, গলা, কবজি, হাত এবং পায়ের নিম্নভাগে রঙিন পুঁতির ব্যান্ড ব্যবহার করত।

৪) মাসাই যোদ্ধারা মাথায় মুকুট দ্বারা নিজেদেরকে সুসজ্জিত করে। এদের পোশাকে কাদা কিংবা লাল মাটির প্রলেপ থাকে। এদের অস্ত্রগুলি লোহার তৈরী।

৫) মাসাই সমাজে সাদা পোশাক শান্তির প্রতীক এবং লাল পোশাক যুদ্ধের প্রতীক।

সামাজিক অভিযোজন ঃ- মাসাইদের সামাজিক অভিযোজনকে বেশ কয়েকটি ধাপে আলোচনা করা হল।

সামাজিক গঠন ঃ- পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন জনজাতির তুলনায় গোষ্ঠীবদ্ধ মাসাইদের একটি স্বতন্ত্র সামাজিক গঠন রয়েছে। এখানে সমাজ গঠনে মাসাই পু(ষ এবং মাসাই মহিলারাই অন্যতম।

মাসাই যোদ্ধা ঃ- মাসাই সমাজে ১৪-৩০ বছর পর্যন্ত বয়সি পুরষরা মাসাই যোদ্দা বা মোরান (Moran) নামে পরিচিত। এই বয়সের সমস্ত মাসাই পু(ষ সমাজের যাবতীয় অনুশাসন, রীতিনীতি মেনে, প্রকৃত যোদ্ধা (পে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বয়স্ক মাসাই ঃ- মাসাই সমাজে বয়স্ক পু(ষদের স্থান সকলেরই উর্দ্ধে। এরাই যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মাসাই সমাজকে পরিচালিত করে। মাসাই দলপতি 'লেইবন' (Liabon) নামে পরিচিত। মাসাই সমাজে এরা অনেক সময় পুরোহিতের কাজ ও করে থাকে।

জনসংখ্যাগত তথ্য ঃ- পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ১৭ ল(ে র ও বেশি মাসাই উপজাতি বসবাস করছে। এর মধ্যে কেনিয়া এবং তানজানিয়াতেই সবচেয়ে বেশি মাসাই উপজাতির বাস। ২০০৯ সালে কেনিয়ার জনগণনায় প্রায় ৮,৪১,৬২২ জন এবং ২০১১ জনগণনায় তানজানিয়ার ৮,০০,০০০ জন মাসাই জনগোষ্ঠীকে চিহ্নি(ত করা গেছে।

আচার অনুষ্ঠান ঃ- মাসাই জনসম্প্রদায় সমাজে যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তা সম্পূর্ণরূপেই বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। শুষ্ক মাসাইল্যান্ড বৃষ্টিতে জমি ফসল ফলানোর উপযোগী হয়ে ওঠার জন্য মাসাইরা আনন্দে মেতে ওঠে। মাসাইদের কয়েকটি আচার অনুষ্ঠান হল -

'এঙ্কিপাটা' ঃ- এটি এমন একটি প্রথা, যেখানে মাসাই সমাজের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে প্রায় ৪ মাস ঘুরে, শেষ দিনে নিকটবর্তী বনে রাত্রিযাপন করার পর ভোর রাত থেকে সারাদিন নাচগান করে পুনরায় গৃহে ফিরে আসে।

'এমুরাজ' ঃ- মাসাইরা নিজেদেরকে যোদ্ধা (পে প্রতিষ্ঠিত করতে এমুরাজ অনুষ্ঠানটিকে উদ্‌যাপন করে।

'ইউনাটো' ঃ- এই অনুষ্ঠানটিকে মূলত মাসাইরা পালন করে নিজেদের একজন পরিণত যোদ্ধার স্বীকৃতি পাওয়ার আনন্দে।

নাচ ও গান ঃ- মাসাইদের প্রত্যেক আচার অনুষ্ঠানেই নাচ ও গানের ব্যবস্থা থাকে। মাসাইদের নাচ দেখতে অনেকটা লাফানোর মতো লাগে।

ধর্ম ঃ- মাসাই অঞ্চলের চারপাশে খ্রিষ্টধর্মের প্রাধান্য থাকলেও মাসাইরা ঐতিহ্যগতভাবে 'একে(রবাদী' (One High God) মহান দেবতার ওপর বি(াসী। মাসাইরা হল 'এঙ্কাই' (Enkai) দেবতার উপাসক। মাসাইরা কল্পনা করে তাদের এই দেবতার, দুটি ভূমিকায় অবতীর্ন হয়। কখনো এই দেবতা শাস্তিদাতা (পে ''Red God'' এবং কখনো পরিত্রাতা (পে ''Black God'' নামে পরিচিত।

বিবাহ ঃ- মাসাই সম্প্রদায়ের মধ্যে সবর্ণের বিবাহ (endogamous marriage) প্রথা প্রচলিত থাকলেও এদের মধ্যে বহুগামিতা ও রয়েছে, অর্থাৎ কোনো ও মাসাইদের ৩-৪ জন স্ত্রী প্রথাগতভাবে থাকতে পারে। তবে এ(ে ত্রে মাসাইদের শখের চেয়ে প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। কারণ এখানকার সমাজে একজন মাসাই এর প্রভাব-প্রতিপত্তি, সম্পত্তি নির্ভর করে তাদের পরিবারের সদস্যা সংখ্যা এবং পালিত পশুসংখ্যার উপর।

অর্থনৈতিক অভিযোজন ঃ- মাসাইদের অর্থনৈতিক অভিযোজন এদের জীবিকা এবং সম্পত্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাসাইদের অর্থনৈতিক অভিযোজন কয়েকটি স্তরে আলোচনা করা হল।

১। পশুসম্পদ (Liverstock) ঃ- গবাদি পশু হল মাসাই অর্থনীতির অন্যতম ও প্রাথমিক ভিত্তি। মাসাইরা প্রচুর সংখ্যক ভেড়া, ছাগল, গো(, মহিষ প্রভৃতি তাদের 'ত্র(াল' - গুলিতে রাখে। সাধারণত এদের খাদ্য তালিকায় মাংস, দুধ, রক্ত(প্রভৃতি পরিবারের পশুগুলির থেকেই পাওয়া যায়। মাসাইরা সাধারণত দৈনন্দিন জীবনে যাবতীয় ভারবহনের কাজে তাদের পালিত 'গাধা'গুলিকে বেশি ব্যবহার করে।

২। পশুসম্পদ (Postoralism) ঃ- পূর্ব আফ্রিকার যে অঞ্চলে মাসাইরা বসবাস করে সেখানে তৃণগুল্মের যথেষ্ট প্রাধান্য থাকায় অর্থনৈতিকভাবে পশুচারণে মাসাই সংস্কৃতির একটি গু(ত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। মাসাইরা গবাদি পশুগুলিকে শুধু খাওয়া কিংবা বিক্রি(র জন্য প্রতিপালন করত না। মাসাইদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যাদুবিদ্যা প্রদর্শনীতেও গবাদি পশুগুলি কাজে লাগে।

ভাষা ঃ- মাসাইদের নিজস্ব ভাষা মা (Maa) একটি স্বীকৃত ভাষা, এছাড়া মাসাইরা অনেকেই প্রতিবেশী সোহাইলি (Swahili) ভাষা এবং ইংরেজি ভাষাও কথা বলে।

সংস্কৃতি ঐতিহ্য ঃ- মাসাইগন আধুনিক সভ্যতার গণকে অনেকটাই ঠেকিয়ে রেখেছেন। প্রথাগত পোশাক ব্যবহারই পছন্দ করেন। প্রথাগত ধর্মীয় সামাজিক রীতিনীতিতে বি(্বাস করেন।

মাসাই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা ঃ- মাসাই সমাজে যে সমস্ত সমস্যাগুলি পরিলি(ত হয় সেগুলি হল —

ক) সামাজিক সমস্যা ঃ- ১) পিতৃতান্ত্রিক মাসাই সমাজের একটি বড়ো সমস্যা হল মহিলাদের উপে(া করে রাখা। মাসাইদের অভ্যন্তরীণ 'Krail' গুলি বাদে অন্যান্য বহির্জগতে মহিলাদের গমন পুরোপুরি নিষিদ্ধ। ফলে বেশিরভাগ মহিলারাই গৃহবন্দি(পে জীবনযাপন করে। তাছাড়া মাসাই সমাজে যেমন বিধবাদের পুর্নবিবাহে সুযোগ নেই তেমনই অসংখ্য মহিলা বহুবিবাহের স্বীকার। যাদেরকে মাসাই পু(ষরা শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রীর স্বীকৃতি দেন।

২) প্রথাগত উপায়ে মাসাইরা পশুপালন এবং সংগ্রহ ভিত্তিক জীবনধারার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত খাদ্য পেয়ে থাকে তা সবসময় শরীরের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম। বর্তমান কেনিয়ার প্রায় ৩.৪ ল(মাসাই খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

৩) স্বাস্থ্য (ে ত্রে মাসাইরা বহুবিধ সমস্যার জর্জরিত। i) মাসাই উপজাতিরা তাদের জটিল রোগগুলিতে প্রথাগত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করে থাকে। অনেক (ে ত্রে অধিকাংশ মাসাইদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে।

ii) মাসাই ল্যান্ডের অত্যন্ত 10% - 20% অধিবাসী HIV রোগে আত্র(ান্ত হন।

iii) এখানকার অনিয়ন্ত্রিত জন্মহার একদিকে যেমন - শিশু মৃত্যুর হারকে বৃদ্ধি করেছে তেমনি জমির উপর জনসংখ্যার চাপ ও দিনে দিনে বাড়ছে।

অর্থনৈতিক সমস্যা ঃ- অর্থনৈতিক দিক থেকে মাসাইদের বহুবিধ সমস্যা রয়েছে যেমন - ১) মাসাই সমাজে দারিদ্র্যতা অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার সবচেয়ে বড়ো দিক। মাসাইল্যান্ডের কোনও ফসল উৎপাদন খুব একটা করা হয় না। কারণ মাসাইরা মনে করে ফসল উৎপাদন মানেই প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিভিন্নভাবে জর্জরিত করা। তাই মাসাইরা স্থানীয়ভাবে যে নূন্যতম পশুজাত এবং সংগৃহীত খাদ্য পেয়ে থাকে তা অভাব মোচনের (ে ত্রে যথাযথ নয়।

২) মাসাইল্যান্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত তাই বহিরাঞ্চলের সঙ্গে অর্থনৈতিক ভাবে যোগাযোগ স্থাপনে মাসাইরা বিরত থাকে।

অন্যান্য সমস্যা ঃ- ১) অতিরিক্ত(পশুচারনের ফলে মাসাইল্যান্ডের অধিকাংশ স্থানের তৃণভূমি ব্যাপকভাবে (তিগ্রস্থ হয়েছে। ফলস্ব(প এখানে ভূমি(য় মাত্রাহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
২) অধিকাংশ মাসাইরা কেনিয়া ও তানজানিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক পরিমাণে বৃ(ছেদন। বৃ(পোড়ানো, চারকোল সংগ্রহ প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত(থাকায় এখানে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র ব্যাপকভাবে (তিগ্রস্থ হয়েছে।